গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ৩ - ৯ জুন, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

বহুজাতিক সংস্থার কাছে কৃষি ও খুচরো ব্যবসার দরজা খুলে দেওয়ার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)

বৃহৎ কর্পোরেট ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে কৃষিক্ষেত্র এবং খুচরো ব্যবসার দরজা খুলে দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩০ মে এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, কৃষিজাত পণ্যের দাম কমানোর অজুহাতে বৃহৎ কর্পোরেট হাউস ও বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে কৃষিক্ষেত্র ও খুচরো ব্যবসার দরজা খুলে দেওয়ার কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত পদক্ষেপের আমরা কঠোর বিরোধিতা করছি। সরকার যখন যথেচ্ছ মজুতদারি, কালোবাজারি, ফাটকাবাজি চলতে দিয়ে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া করে তুলছে এবং খাদ্য সহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার জনগণের দাবি না মেনে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে অস্বীকার করছে, তখন এই নতুন প্রস্তাব মুনাফালোভী কর্পোরেট হাউস ও রাঘববোয়াল বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে কৃষিক্ষেত্রে ঘাঁটি গেড়ে বসে জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণের এমন সুযোগ করে

চারের পাতায় দেখুন

গড়বেতায় লেনিনের মূর্তি ভাঙায় দোষীদের শাস্তির দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৭ মে এক বিবৃতিতে বলেছেন —

গড়বেতায় মহান লেনিনের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত। আমরা এই জঘন্য ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। ২০০৮ সালের ১৩ মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আমাদের দলের আন্দোলনের জোট গড়ে তোলার তিনটি শর্তের মধ্যে ছিল বামপন্থা ও মার্কসবাদকে আক্রমণ করা হবে না।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রী সেদিন এই শর্ত মেনে জোট গঠন করেছিলেন। সিপিএম-এর গণআন্দোলন দমন, দুর্নীতি, ঔদ্ধত্যের যে অপশাসন সিপিএম এ রাজ্যে চালাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের একটা বড় অংশই বামপন্থা ও মার্কসবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তৃণমূল নেত্রীও এ পর্যন্ত বামপন্থা ও মার্কসবাদের বিরুদ্ধে কোনও আক্রমণাত্মক কথা বলেননি, বরঞ্চ তিনি বলেছেন, তিনি বামপন্থার বিরোধী নন, গান্ধীজীকে যেমন তিনি শ্রদ্ধা করেন, মার্কসকেও শ্রদ্ধা করেন।

আমাদের দল ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী ও গান্ধীজীর মূর্তির উপর যখনই কোনও আক্রমণ হয়েছে, তার নিন্দা করেছে, ধিক্কার জানিয়েছে।

আমরা আশা করি, বর্তমান সরকার গড়বেতার ঘটনার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে এবং এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কঠোর হস্তে বন্ধ করবে।

অস্ত্র উদ্ধার ঃ পুলিশ সুপারের শাস্তি দাবি

২৪ মে পশ্চিম মেদিনীপুর ডি এম অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন। সংবাদ দুইয়ের পাতায়।

রাষ্ট্র গরিব উচ্ছেদে নেমেছে, গড়ে উঠছে প্রতিরোধও

মহারাষ্ট্রে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের জয়

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারত জুড়েই তৈরি হচ্ছে অসংখ্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম। চলছে দরিদ্র মানুষকে উচ্ছেদ করার পালা। পুলিশ-প্রশাসনের প্রশ্রয়ে অবাধে চলছে প্রোমোটার রাজ। বিপরীতে প্রায় সর্বত্রই বসতি উচ্ছেদ করে বেআইনি বহুতল নির্মাণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন মানুষ, প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। বহুক্ষেত্রেই জয়যুক্ত হচ্ছে তাঁদের আন্দোলন।

সম্প্রতি এভাবেই জয়ী হল মহারাষ্ট্রের উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন। মুম্বাইয়ের গোলিবার এলাকায় গণেশ কৃপা সোসাইটি নামক বসতিটি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে সেখানে বেআইনি বহুতল নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল শিবালিক ভেঞ্চার্স নামক একটি নির্মাণ সংস্থা। উচ্ছেদের মুখে পড়েছিল সেখানকার ২৬ হাজারেরও বেশি পরিবার। প্রখ্যাত সমাজকর্মী শ্রীমতী মেধা পাটকরের নেতৃত্বে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন এলাকার মানুষ। সমর্থনে এগিয়ে আসেন গোটা দেশের বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন। অসংখ্য চিঠি, ফ্যাক্স ও ই-মেল যেতে থাকে প্রধানমন্ত্রী ও মহারাষ্ট্র সরকারের দপ্তরে। আন্দোলনের প্রবল চাপের মুখে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকার। গোলিবার বসতি উচ্ছেদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

সাতের পাতায় দেখুন

মুম্বইয়ে অনশন মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন মেধা পাটকর

স্পেনের শহরে শহরে লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ

মধ্যপ্রাচ্য থেকে আবার ইউরোপ। এবার গণবিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে স্পেন। মিশর, টিউনিশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের সংগ্রামী মেজাজ ও দৃঢ়তা থেকে প্রেরণা নিয়ে স্পেনের জনগণ রাস্তায় নেমেছে পুঁজিবাদী ব্যয় সংকোচ ও ব্যাপক বেকারির বিরুদ্ধে আন্দোলনে। গত ১৫ মে থেকে স্পেনের শহরে শহরে বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে, বাজার-চকের দখল নিয়েছে জনগণ।

আরও যেটা লক্ষণীয় তা হচ্ছে, দেশব্যাপী নির্বাচনের মুখেই এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, নির্বাচনের পরও তা চলছে। গণবিক্ষোভে জল ঢালতে পারেনি ভোট। ২২ মে স্পেনের আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরের নির্বাচনের ৭ দিন আগে বিক্ষোভ শুরু হয়। সরকারি ব্যয়সংকোচ কর্মসূচি ও বেকারির বিরুদ্ধে তো বটেই, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কিছু সংস্কারেরও দাবি তুলেছে জনসাধারণ।

'শিল্পোন্নত' স্পেনে বেকারির হার চমকে ওঠার মতো। কর্মক্ষম মানুষের ২১.৩ শতাংশেরই কোনও চাকরি নেই। বেকারির এই হার ইউরোপে সর্বোচ্চ। ১৮ থেকে ২৫ বছরের যুবকদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা আরও ভয়াবহ, এদের ৪৫ শতাংশই বেকার। যুবকদের অবস্থা এতই খারাপ যে এদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে 'ভবিষ্যৎহীন যুব সম্প্রদায়', 'হারিয়ে যাওয়া প্রজন্ম।' বহু যুবকও নিজেরাই বলে, 'আমরা শেষ হয়ে গেছি।'

১৫ মে পথে নেমেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। মাদ্রিদে বিক্ষোভের পর যুবক ও শ্রমিকরা সেখানকার কেন্দ্রীয় পার্ক পুয়েরতা দেল সল-এ জড়ো হয় এবং রাতভর দখল কায়েম রাখে। এই খবরে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরেও ময়দান, পার্ক-এর দখল নিয়ে নেয় সাধারণ মানুষ। এক সপ্তাহে দেশের ১৬৬টি শহরে গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। স্পেনের আন্দোলনের সংবাদে ইটালিতে অন্তত পক্ষে ১০ জায়গায় শহরের পার্ক দখল করে নিয়েছে জনতা, ডোমিনিকান রিপাবলিকে স্পেনের দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ হয়েছে।

পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন মিডিয়া দেখাতে চেয়েছে এই বিক্ষোভের পিছনে বিভিন্ন সোস্যাল নেটওয়ার্ক-এর ভূমিকাই প্রধান, যেভাবে ঠিক মিশরের আন্দোলনের সময়েও দেখানো হয়েছিল

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিধায়ক পদে কোটিপতিদেরই প্রাধান্য বাড়ছে

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেল। একই সঙ্গে তামিলনাড়ু, কেরালা, আসাম ও পন্ডিচেরিতেও নির্বাচন শেষ হয়েছে। ফলাফলও প্রকাশিত। নতুন সরকারকে ঘিরে জনগণের মধ্যে অনেক আশা। কিন্তু পরিবর্তন-প্রত্যাবর্তন-পালাবদলের বহুচর্চিত বিষয়ের পরিবর্তে আমরা এখানে একটু চোখ ফেরাব নবগঠিত বিধানসভাগুলির দিকে, দেখতে চেষ্টা করব নির্বাচিত হয়ে এসেছেন কারা।

বিধানসভায় প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে গেলে প্রত্যেককে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির একটি হিসাব দিতে হয়। এটা সরকারি নিয়ম। নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিজেদেরই ঘোষিত সম্পত্তির সেই হিসাব দেখতে গিয়ে এমন কয়েকটি তথ্য পাওয়া গেল, যা রীতিমতো বিস্ময়ের। বিধানসভায় নির্বাচিত এইসব প্রতিনিধির প্রতি তিন জনে এক জন কোটিপতি।

উপরোক্ত ৫ রাজ্যে বিধায়কদের মোট সংখ্যা ৮২৪ (পশ্চিমবঙ্গ ২৯৪, তামিলনাড়ু ২৩৪, কেরালা ১৪০, আসাম ১২৬ ও পন্ডিচেরি ৩০)। দেখা যাচ্ছে, এঁদের মধ্যে ২৬৮ জনই কোটিপতি। এঁদের মধ্যে তামিলনাড়ুর বিধায়করা হলেন সবচেয়ে ধনী। তাঁদের গড় সম্পত্তিই একেকজনের প্রায় ৪ কোটি টাকা। ছোট্ট রাজ্য পণ্ডিচেরিও কম যায় না। সেখানে ৩০ জন বিধায়কের মধ্যে ১৯ জনই কোটিপতি। আসাম আর কেরালাতেও একেকজন বিধায়ক গড়ে এক কোটি টাকার মালিক। বাংলার বিধায়করা একেকজন গড়ে ৬৮ লক্ষ টাকার মালিক। (তথ্যসূত্র: টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১৯ মে, ২০১১)

এ রাজ্যে ২৯৪ জনের মধ্যে ৪৭ জন বিধায়ক কোটিপতি। এবার ৭১ জন কোটিপতি ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিলেন। মোট ১২৬৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার নিচে সম্পত্তির অধিকারী এমন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৪১১ জন। বাকিরা তার উপরে। লাখপতি প্রার্থীর চেয়ে কোটিপতি প্রার্থীর জেতার হারই অনেক বেশি। ২০০৬ সালে কোটিপতি বিধায়ক ছিলেন ২ শতাংশ, এবার হয়েছেন ১১ শতাংশ। (সূত্র ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ, বর্তমান ২৮-৫-১১)

আরও কিছু চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে। গত বিধানসভার যেসব বিধায়ক এবার আবার প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের দাখিল করা হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, গত ৫ বছরে তামিলনাড়ুতে তাঁদের সম্পত্তি বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩ গুণ, সম্পত্তি বৃদ্ধির হার ১৯৬ শতাংশ। আসাম বা কেরালাও অবশ্য খুব একটা কম যায় না, যথাক্রমে তা ১৮৭ ও ১৭৫ শতাংশ। পণ্ডিচেরির বিধায়করাও গত ৫ বছরে ১৩৬ শতাংশ সম্পত্তি বাড়িয়ে নিতে পেরেছেন। আর এ পোড়া বঙ্গের প্রতিনিধিরা ৫ বছরে গড়ে সম্পত্তি বাড়িয়ে প্রায় দ্বিগুণ করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের সম্পত্তি বৃদ্ধির হার ৭১ শতাংশ। (তথ্যসূত্র ঐ)

এই সম্পদ বৃদ্ধির উৎস কী? ২০০৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, কেউ মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করলে বার্ষিক ১০.৮৬ শতাংশ হারে রিটার্ন পেয়েছেন, অর্থাৎ ৫ বছরে বৃদ্ধির মোট হার প্রায় ৬৭ শতাংশ, সবচেয়ে গরিব বাংলার বিধায়কদের তুলনায়ও কম। ঐ সময়ে সেনসেক্সের নথি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, শেয়ার বাজারে মোট বৃদ্ধির হার মাত্র ৬৪ শতাংশ। ব্যাংকে ফিক্সড জিপোজিটে টাকা রাখলে ঐ ৫ বছরে টাকা বেড়েছে আরও কম, মাত্রই ৪৬ শতাংশ। আর এই সময়ে সবচেয়ে চড়া গেছে যে সোনার দর, সেখানেও দেখা যাচ্ছে ১৩৮ শতাংশের বেশি লাভ করা যায়নি। অর্থাৎ পণ্ডিচেরির একজন বিধায়ক গত ৫ বছরে সমস্ত সম্পত্তি সোনায় বিনিয়োগ করলে যে লাভ ঘরে তুলতে পারতেন তাই তুলেছেন। আর আসাম, কেরালা ও তামিলনাড়ুর বিধায়কদের কাছে তো এ হিসাবও নস্যি।

কোথায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কোনক্রমে দিন আনি দিন খাই বেঁচে থাকা, আর কোথায় কোটিপতি। অবশ্য দেশের যে বিশাল সংখ্যক মানুষ গ্রামাঞ্চলে বিপিএল মানদণ্ড অনুযায়ী দিনে গ্রামাঞ্চলে ১৫ টাকা ও শহরাঞ্চলে দিনে ২০ টাকা রোজগারে কোনওভাবে একবেলা আধপেটা খেয়ে দিন কাটায়, তাদের পক্ষে কত টাকায় এক কোটি হয় তা ঠিকঠাক ঠাহর করতে পারাই মুশকিল। তবু বিধানসভায় তাদেরই প্রতিনিধিরা সব কোটিপতি। গণতন্ত্রের কী মহিমা! গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে এই তো পুঁজিতন্ত্র!

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এমনটাই হয়ে থাকে। এটা বস্তুত ধনীদেরই ব্যবস্থা। প্রকৃত গরিব সাধারণ মানুষের স্থান সেখানে নিতান্তই নগণ্য। গণতন্ত্র, রাজনৈতিক সাম্য প্রভৃতি আজ কেবলই গালভরা কথা মাত্র। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম যখন পুঁজিবাদ ক্ষমতায় এসেছিল, সেদিন সেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সে এইসব মহতী ধারণার জন্ম দিয়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে তার পরিবর্ত হিসাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনে এইসব ধারণা ও আদর্শই ছিল তার পাথেয়। কিন্তু পুঁজিবাদ একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশের পর ইউরোপীয় নবজাগরণ ও বলিষ্ঠ মানবতাবাদের সেইসব বৈশিষ্ট্য আজ অবলুপ্তপ্রায়। একচেটিয়া ও ফাটকা পুঁজির এই যুগে তীব্র বাজার সংকটই সবচেয়ে রূঢ় বাস্তব। আর তার ধাক্কায় ধুঁকতে থাকা পুঁজিবাদ আজ শুধু চায় তার প্রাণভোমরা সর্বোচ্চ মুনাফাটুকু যেকোনও ভাবেই হোক বজায় রাখতে। আর, মুনাফা কখনও সৎপথে আসে না। মুনাফার উৎসই হচ্ছে শ্রমিকদের শোষণ। শ্রম দেওয়ার জন্য শ্রমিকের যত মজুরি পাওয়ার কথা, মালিক তা পুরোটা না দিয়ে একটা অংশ নিজের পকেটে ভরে এবং সেটাই মুনাফা। প্রচলিত যে উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তিতে এই জালিয়াতি কাজ করছে, সেই ব্যবস্থায় রাজনীতি ও সমাজ দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হবেই। এই মুনাফাবৃত্তিতে কোন আদর্শ রইল আর কোন আদর্শ গেল তাতে পুঁজিবাদের কিছু যায় আসে না। বরং ঐসব আদর্শগুলোই আজ তার পথের কাঁটা। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আয়ুষ্কাল যত বাড়ছে, ততই বেড়ে চলেছে আদর্শবাদের সংকট, বাড়ছে যেকোনও উপায়ে সম্পদবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা।

যাঁরা বিধানসভায় গেলেন, তাঁদের বেশির ভাগই প্রাচুর্যের মানুষ। রাজ্যের শাসনভার তাঁদেরই হাতে। গরিব সাধারণ মানুষদের নিজেদের মধ্যে থেকে যাওয়া প্রতিনিধির সংখ্যা সেখানে রইল এতই সামান্য যে বাস্তবে তাঁরা সরকারের আনা কোনও জনবিরোধী নীতিকে আটকে দিতে পারবেন না। গণতন্ত্রের ঢক্কানিনাদের আড়ালে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াটা আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, যথেষ্ট পরিমাণ টাকা খরচের ক্ষমতা ছাড়া তাতে কল্কে পাওয়াই দুষ্কর। ১০,০০০ টাকা জামানত জমা রাখা থেকে শুরু করে সমস্ত প্রচারেই বিপুল খরচ। নির্বাচন কমিশনের একের পর এক বিধিনিষেধের ধাক্কায় দেওয়াল লিখন, পোস্টার লাগানো, মিছিল-মিটিং ইত্যাদি কম খরচে প্রচারের প্রচলিত যাবতীয় পদ্ধতিই এখন উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত। আর প্রচারের বিকল্প আধুনিক বেশিরভাগ পন্থাই যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ। বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াতেও তারাই প্রচার পায়, যারা ঐ পুঁজিগোষ্ঠীর স্বার্থ কোনও না কোনও ভাবে রক্ষা করছে বা তাদের প্রচুর টাকা দিচ্ছে। সর্বত্রই মানি, মাসল ও মিডিয়া শক্তির যে বিপুল দাপট, তাতে পকেটে ভালো পরিমাণ অর্থ ছাড়া সোজা পথে জিতে আসা প্রায় অসম্ভব। এর অন্যথা ঘটতে পারে কেবল সেসব ক্ষেত্রে যেখানে শোষিত জনগণ শ্রেণী রাজনীতি ও চেতনার ভিত্তিতে সুসংগঠিত।

বিধায়কদের যে ঐ বিপুল সম্পত্তি বৃদ্ধি, কোনওরকম দুর্নীতি ছাড়া সোজা পথে কি তা কখনও সম্ভব হয়েছে? দেশের কোটি কোটি মানুষ যখন অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, তখন তাদেরই নাম করে তাদেরই মাথায় বসে মুষ্টিমেয় কিছু ধনকুবের ছলে বলে কৌশলে নীতি-নৈতিকতা সব শিকেয় তুলে রেখে শুধু টাকা কামিয়ে চলেছে। এই হচ্ছে বর্তমানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরকার চেহারা।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ সদস্য ও সকলের 'মাসীমা' কমরেড প্রতিভা গুপ্ত দীর্ঘদিন বয়সজনিত অসুস্থতার পর গত ১৬ মে বেহালায় নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার তাঁকে চিকিৎসার জন্য ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল।

জগৎপুর রুক্মিণী বিদ্যামন্দির ফর গার্লস-এর প্রধান শিক্ষিকারূপে তিনি এলাকায় কেবল সুপরিচিত ছিলেন তাই নয়, ছাত্র ও অভিভাবকদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিলেন। বিদ্যালয়টিকে শৈশব অবস্থা থেকে একটি প্রখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পিছনে কমরেড প্রতিভা গুপ্তর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরিবারে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবে তিনি নিজের চেয়ে অন্যদের কথা বেশি ভাবতে শিখেছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের ভাল মন্দ ছিল তাঁর সর্বক্ষণের ভাবনা। এজন্যই সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন প্রিয় 'বড়দি'। সিপিএম ১৯৭৭ সালে সরকারে বসার অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বাতিল করে। প্রতিবাদে কমরেড প্রতিভা গুপ্ত তাঁর বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগে ইংরেজি পঠন-পাঠন চালু রাখেন। সরকারি রক্তচক্ষু তাঁকে টলাতে পারেনি।

কমরেড প্রতিভা গুপ্ত তাঁর সন্তানদের মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। অবসর গ্রহণের পর পরিণত বয়সে তিনি দলের কাজ শুরু করেন। পরিণত বয়সে নানা বিষয়ে পুরনো সংস্কার ও ধ্যানধারণা ত্যাগ করে নতুন চিন্তাকে গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী নিজের সংস্কৃতি ও কর্মধারাকে বদল করার কঠিন সংগ্রামে তিনি বহুদূর এগিয়েছিলেন। দলের আদর্শ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গভীর আবেগ থেকে তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও দলের প্রতিটি সভায় প্রয়োজনে অন্য কমরেডদের সহায়তা নিয়েও উপস্থিত হতেন। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে তিনি এলাকার মহিলাদের সংগঠিত করার কাজ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে বৃত্তিপরীক্ষা চালু হলে শিক্ষাব্রতী হিসাবে তিনি পর্ষদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। এ ছাড়াও বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, নারীনির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে নানা গণআন্দোলনেও তিনি সাধ্যমত অংশ নিয়েছেন। নবজাগরণের মনীষী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের স্মরণ অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি শারীরিক বাধা উপেক্ষা করে বিশেষ উৎসাহে উপস্থিত হতেন।

২২ মে দলের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে বেহালা আর্য সমিতি হলে প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী। সভাপতিত্ব করেন কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমিতা ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী ও মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়।

কমরেড প্রতিভা গুপ্ত লাল সেলাম

পঃ মেদিনীপুরে সিপিএমের গোপন অস্ত্রভাণ্ডার পুলিশের মদতেই

জেলাশাসকের দপ্তরে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর নাকের ডগায় কী করে জঙ্গলমহল সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন প্রান্তে সিপিএমের পক্ষে বিপুল অস্ত্র গোপনে মজুত করা সম্ভব হল— এই প্রশ্ন তুলে ২৪ মে এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়, বাইরে চলে বিক্ষোভ।

জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি বলেন, নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলনকে ভাঙতে সিপিএম সরকার যে বীভৎস অত্যাচার চালিয়েছিল, পরবর্তী পর্বে তা কেন্দ্রের কংগ্রেস ও রাজ্যের সিপিএমের যৌথ পরিকল্পনায় লালগড় সহ জঙ্গলমহলে নারকীয় রূপ নেয়। যৌথবাহিনীর মদতে সিপিএমের সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী কীভাবে সর্বত্র দাপিয়ে বেড়িয়েছে, এখন উদ্ধার হওয়া মজুত অস্ত্রভাণ্ডার তা প্রকট করে দিয়েছে। এনায়েতপুরে সিপিএমের অফিস সংলগ্ন এলাকা থেকে ইনসাস, এ কে ৪৭ রাইফেল সহ বিপুল অস্ত্রের উদ্ধার প্রমাণ করেছে যে, শিলদা কাণ্ড সিপিএম ক্রিমিনালদের দিয়েই ঘটানো হয়েছিল। এই সম্ভাবনার কথা সে সময়েই এস ইউ সি আই (সি) বলেছিল। সদর ব্লকের ধেড়ুয়া ১নং অঞ্চলের বয়লাশোল, কুকুরমুড়ি, চিলগোড়া, চাঁদরা ২নং অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায়ও অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। এমনকী ৪ নং কনকাবতী অঞ্চলে সিপিএম অফিস থেকে বিপুল অস্ত্র সহ পাওয়া গেছে গর্তে পুঁতে রাখা মানুষের কংকাল। বিভিন্ন জায়গায় সিপিএম অফিস থেকেই পাওয়া যাচ্ছে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর পোশাক। পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর মুখোশ। পিংলাতে জনগণ তিনদিন একটানা দিবারাত্র সিপিএম অফিস ঘিরে রাখার পর পুলিশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে অফিস খুলে পায় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র।

আমাদের দল দীর্ঘদিন ধরে জেলা ও রাজ্য প্রশাসনকে, এমনকী রাজ্যপালকেও কমপক্ষে ১১৯টি ক্রিমিনাল ক্যাম্পের অবস্থান উল্লেখ করে, সেই ক্যাম্প ভাঙা ও সিপিএম ক্রিমিনালদের গ্রেপ্তারের দাবি জানালেও রাজ্য সরকার, বিশেষ করে জেলা পুলিশ সুপার ও প্রশাসনিক কর্তারা এরকম কোনও কিছুর অস্তিত্বই নাকি দেখতে পাননি! নেতাই কাণ্ডের পরেও পুলিশ সুপার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর হেড কম্যান্ডার 'চিরুনি তল্লাশি' চালিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'জঙ্গলমহলের কোথাও সিপিএমের সশস্ত্র ক্রিমিনাল ক্যাম্পের হদিস এবং অস্ত্র পাওয়া যায়নি।' এখন প্রমাণিত হচ্ছে, না দেখার ভান করে শত শত মানুষকে হত্যা, মা-বোনেদের ধর্ষণ সহ বীভৎস অত্যাচার এই পুলিশ-প্রশাসন এতদিন চালাতে দিয়েছে ঠাণ্ডা মাথায়। ফলে এই সমস্ত অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষভাবেই এরা জড়িত।

এখন, আক্রান্ত বিপর্যস্ত জনগণ সিপিএম সরকারকে বিদায় করে, সর্বত্র বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার প্রশাসনকে উদ্ধার করতে একপ্রকার বাধ্য করছে। আশ্চর্যের হলেও সত্য, এখনও পর্যন্ত এ জেলার পুলিশ-প্রশাসন ঐ সমস্ত ক্রিমিনালদের রক্ষারই মরিয়া চেষ্টা করে যাচ্ছে। যে কারণে এখনও সিপিএমের দাগি ক্রিমিনালরা গ্রেপ্তার হয়নি, যা স্বাভাবিক জনজীবন ফিরে আসার পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

কমরেডস অমল মাইতি ও প্রাণতোষ মাইতির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের কাছে দাবি করেছেন, ১) এনায়েতপুরে প্রাপ্ত শিলদা থেকে লুঠ হওয়া অস্ত্র সহ সর্বত্র অস্ত্র মজুতের নায়ক সিপিএম ক্রিমিনালদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে; ২)

আটের পাতায় দেখুন

গরিব মানুষদের খাদ্যশস্য দেওয়া প্রসঙ্গে

কোর্টের রায়ে উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই

সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করতে চলেছে বলে সংবাদে প্রকাশ। নির্দেশে বলা হয়েছে, দেশের গরিব মানুষকে বাড়তি ৫০ লক্ষ টন গম, চাল দেওয়া হবে। তথাকথিত দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে থাকা গ্রাহকদের জন্যও বাড়তি চাল গম দেওয়া হবে। এর পরিমাণ ৩৩ লক্ষ টন। আর দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ৬ কোটি ৫২ লক্ষ পরিবারের জন্য ৫০ লক্ষ টন চাল গম দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ১১.০২ কোটি এপিএল পরিবারও উপকৃত হবে। ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার হিসেব মতো এখন ২৩০ লক্ষ টন চাল ও ১৫০ লক্ষ টন গম মজুত রয়েছে। গোটা দেশে বার্ষিক চাহিদা ১৪০ লক্ষ টন চাল ও ৭০ লক্ষ টন গম। অবশ্য এই চাহিদাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনুযায়ী টাকা দিয়ে কেনবার ক্ষমতার সঙ্গে মিলিয়েই বুঝতে হবে। (সূত্র ঃ বর্তমান, ১১-৫-২০১১ ও ১৩-৫-২০১১)

হঠাৎ চাল-গম দেওয়া প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট সরব কেন? হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য গুদামগুলিতে পচিয়ে ফেলার খবর ফাঁস হওয়ার পর এক জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে তিরস্কার করে বলে, যে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে থাকে সেখানে অবহেলায় খাদ্যশস্য পচানো একটা গুরুতর অপরাধ। এই বাড়তি খাদ্যশস্য দেশের গরিবদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলিয়ে দেওয়া হোক। একটি মানবাধিকার সংগঠনের রুজু করা এই জনস্বার্থ মামলার পরিণতিতে এই রায়। এই সূত্রে জানা যায়, মজুত বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যের একটা বড় অংশ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে ইতিমধ্যেই 'পশুখাদ্য' হিসাবে রপ্তানি করা হয়েছে। ঐ মামলার সওয়ালে সারা দেশের জনগণের মধ্যে অনাহার, অপুষ্টি ও শিশুদের অপুষ্টির কারণে পাঁচ বছর বয়স পেরোনোর আগেই মৃত্যুর ভয়াবহতার ছবি উঠে আসে। বিদেশে পশুখাদ্য হিসাবে রপ্তানি বন্ধ রেখে অনাহারী অর্ধভুক্ত মানুষকে, অপুষ্টির শিকার শিশুদের খাদ্য জোগান দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করার জন্য সওয়াল করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ২০১০-১১ কৃষিবর্ষে খাদ্যশস্যের ফলন হয়েছে রেকর্ড পরিমাণে। মোট পরিমাণ ২৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮০ হাজার টন। গম, ডাল ও যব হয়েছে ৩ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন (বর্তমান ১৯-৫-২০১১)। সুতরাং মজুত খাদ্য ও চলতি বছরে যে খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে তার পরিমাণ বিপুল, বিরাট। তাহলে কি দেশের সব মানুষ খেতে পাবে? অনাহার থাকবে না? অপুষ্টি থাকবে না? ব্যাপারটা মোটেই সে রকম হবে না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সাময়িক সুফলটুকুই জনতার নিট লাভ, অবশ্য যদি তা সরকার কার্যকর করে। কারণ গরিবদের মধ্যে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে উদ্বৃত্ত খাদ্য বিলিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া ছিল — ''তা হলে কৃষকদের উৎপাদনে উৎসাহ নষ্ট হয়ে যাবে।'' অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য হল অনাহারে থাকলে, অর্ধভুক্ত থাকলে, দারিদ্র্যের হাহাকার থাকলে, অপুষ্টি থাকলে, অপুষ্টিতে, অনাহারে মৃত্যু থাকলে, বাঁচার তাগিদে মানুষ উৎপাদনে উৎসাহ পাবে। কী সাংঘাতিক বিচারবোধ! পুঁজিবাদী লুণ্ঠনের জনস্বার্থবিরোধী গণহত্যাকারী অর্থনীতির যোগ্য নেতা হিসাবেই প্রধানমন্ত্রীর এই বিচারবুদ্ধি, হৃদয়বৃত্তি এবং কর্তব্যবোধ। এমনটাই হয়। চূড়ান্ত আত্মসর্বস্বতা, চূড়ান্ত লাভ, চূড়ান্ত বঞ্চনাই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। এই তার বিশ্বজনীন চরিত্র। সব দেশে। এই পথেই প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ইউপিএ জোটের পরিচালনায় আগামী ভারতবর্ষে খাদ্য আরও উদ্বৃত্ত হবে। বাস্তবে গরিব বাড়বে — কিন্তু কাগজে কলমে কমবে। গরিব কমলে অন্তত নীতিগতভাবে গরিবদের প্রতি খাওয়ানোর দায়িত্বও কমবে। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'উন্নয়ন' পরিকল্পনা সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। প্ল্যানিং কমিশনের প্রস্তাবে তাই গরিবদের এক নতুন বীভৎস ও নির্লজ্জ সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। শহরের একজন মানুষ, যে ঘরভাড়া ও যাতায়াত খরচ করে মাসে ৩১ টাকা, শিক্ষাখাতে ১৮ টাকা, ওষুধপত্র বাবদ ২৫ টাকা, সব্জিবাজার ৩৬.৫ টাকা, সে আর গরিব নয়। মাসে ৫৭৮ টাকা বা দৈনিক ২০ টাকার বেশি খরচ করলে তাকে আর গরিব বলা যাবে না। তেমনই গ্রামের মানুষ যদি ১৫ টাকার বেশি দৈনিক খরচ করে তবে আর সে গরিব নয় (সূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া)। সুতরাং গরিবদের সহায়তা করার দায় কমে আসবে। 'উন্নয়ন' এগিয়ে চলবে। গরিবের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য ভরতুকিও কমবে — বাড়বে বড় বড় মালিক ও কর্পোরেট হাউসের জন্য ভরতুকি— যাতে তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা আরও সুনিশ্চিত হয়। ক্রমাগত বাজারের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার দরুন যে বাজার সংকট শিল্পপতি ও কর্পোরেট হাউসগুলোকে বিপর্যস্ত করতে চাইছে, তার ধাক্কা সরকারের সাহায্যে সামাল দিয়ে তারা মুনাফা বাড়িয়ে যেতে পারে। সাধারণ মানুষের বেকারত্ব বাড়লেও কর্মসংস্থানের সুযোগ কমতে থাকলেও, ছাঁটাই, লে-অফ-এর ধাক্কায় কোটি কোটি শ্রমজীবী জীবিকাচ্যুত হলেও, ফসলের লাভজনক দাম না পেয়ে ক্রমাগত নিম্নচাষিদের ভূমিহীন চাষি ও কৃষি মজুরের স্তরে অধঃপতিত হয়ে তাদের ভিড় বাড়তে থাকলেও জাতির গড় উৎপাদন ও আয় বাড়তে থাকবে। 'উন্নয়নের' ছবি আরও রঙীন হয়ে উঠবে। বিশ্বায়নের অর্থনীতির একজন নির্ভরযোগ্য প্রবক্তা নামকরা দৈনিকে তাই লিখতে পেরেছেন — দেশের গরিব মানুষের কর্মসংস্থান হল কি হল না তা দিয়ে আর্থিক উন্নয়ন বিচার হতে পারে না। কারণ হিসাবে তাঁর যুক্তি হল গরিব মানুষ নিজস্ব তাগিদেই কিছু না কিছু করবে। না হলে সে মরে যাবে। বড় নির্মম সত্যি কথা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের কর্মহীনতা ও দারিদ্র্যে 'উন্নয়নের' ধারা ব্যাহত হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই বিচারেই দেশের উন্নয়ন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে অব্যাহত ও ত্বরান্বিত হচ্ছে। বিজেপিও ক্ষমতায় বসে 'ইন্ডিয়া সাইনিং' নামে এই ধারারই জয়গান করেছে। এই ধারারই ধারক-বাহক হিসাবে রাজ্যের সিপিএম 'উন্নততর' সিপিএম ফ্রন্ট শাসন চালিয়ে ৩৫ বছর পর বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। আগামী দিনে এই ধারাই যদি অব্যাহত থাকে তবে মানুষের অবস্থা বদলাবে তো না-ই, বরং দুর্দশার বালিতে তা আরও ডুববে।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, আয়নায় নিজের মুখ দেখুন

রাজ্য প্রশাসন কীভাবে চালানো উচিত, সে বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু পরামর্শ দিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরদিন, ১৪ মে, একটি বাংলা দৈনিকে।

গুজরাট রাজ্যটিকে ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরে সংবাদপত্রে প্রশংসার বন্যা বয়ে চলেছে। 'সুশাসন' এবং 'উন্নয়ন'-এর বিচারে গুজরাট নাকি ভারতের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে। সেই 'সুশাসন' ও 'উন্নয়ন'-এর কাণ্ডারি হওয়ার সুবাদেই বোধহয় নরেন্দ্র মোদি এই জ্ঞানগর্ভ চিঠিটিতে 'উন্নয়ন'-এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। চিঠিতে মোদি জানিয়েছেন, তাঁদের রাজ্যে ব্যবসার নাকি একটি অভিনব চরিত্র আছে। সেখানে 'বিনিয়োগকারী, পুঁজিপতি, ম্যানেজার এবং শ্রমিক সকলেই যেন এক পরিবারের সদস্য। ...শ্রেণীসংঘাত নয়, বরং মালিক-শ্রমিক সখ্য দেখার মতো।'

এই মালিক-শ্রমিক সখ্যতা সেখানে শ্রমিকদের জীবনে কোন সুদিন এনেছে তা বোঝার জন্য সে রাজ্যের গিনিং শিল্পের (বীজ থেকে তুলো আলাদা করা) শ্রমিকদের অবস্থার দিকে চোখ ফেরানো যাক। এ সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে 'প্রয়াস সেন্টার ফর লেবার রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন' নামক একটি গবেষণা সংস্থা। হাঁড়ির ভাত সেদ্ধ হয়েছে কি না তা বুঝতে যেমন একটি ভাত পরীক্ষা করাই যথেষ্ট, তেমনই এই একটি শিল্পের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা বোঝার চেষ্টা করলেই বোঝা হয়ে যাবে, কেমন আছেন গোটা গুজরাটের শ্রমিকরা এবং সে রাজ্যের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটাই বা কেমন।

কটন গিনিং শিল্প ও তার সহযোগী শিল্পগুলি হল গুজরাটের কৃষিভিত্তিক শিল্পের মধ্যে প্রধান। ৫০০টিরও বেশি গিনিং কারখানা আছে সে রাজ্যে। প্রধানত উত্তর, মধ্য গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে এই কারখানাগুলি অবস্থিত। গিনিং শিল্পের শ্রমিকরা হলেন মরশুমি শ্রমিক — প্রধানত নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কাজের মেয়াদ এঁদের । প্রতিটি কারখানায় গড়ে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। গোটা রাজ্যে ৫০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক গিনিং শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কারখানার কাজ পান এই শ্রমিকরা। ফলে মিল-মালিক ও কন্ট্রাক্টরের মধ্যে তাঁদের নিয়ে কী চুক্তি হল, সে বিষয়ে এঁরা থেকে যান সম্পূর্ণ অন্ধকারে। স্থানীয় শ্রমিকরা ছাড়াও প্রতি বছর দক্ষিণ রাজস্থান থেকে দলে দলে মজুর এসে গিনিং কারখানায় কাজে লাগেন। এঁদের একটা বড় অংশই মহিলা। শুধু তাই নয়, কমবয়সী কিশোর-কিশোরী, এমনকী শিশুশ্রমিকের সংখ্যাও বিপুল। কম মজুরিতে কাজ করানো যায় বলে মহিলা ও শিশুশ্রমিকের চাহিদা গিনিং শিল্পে যথেষ্ট বেশি।

এবার দেখা যাক, কন্ট্রাক্টরের হাত ঘুরে দলে দলে খাটতে আসা শ্রমিকদের জন্য কী ধরনের কাজের পরিবেশ তৈরি করে রাখেন কারখানার মালিক-ম্যানেজাররা। হাজার হোক, মুখ্যমন্ত্রী মোদির কথা মানতে হলে, এইসব শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁরা তো পারিবারিক বন্ধনেই জড়িত!

গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, অত্যন্ত দুর্বিষহ পরিবেশে সুদীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয় গিনিং কারখানার মজুরদের। সমস্ত শ্রমিকেরই কাজের সময়সীমা ১২ ঘণ্টা, কাজের চাপ বাড়লে কখনও কখনও তাদের দুই শিফটে অর্থাৎ টানা ২৪ ঘণ্টাও কাজ করতে বাধ্য করে মালিক। কাজের পরিবেশও কহতব্য নয়। শ্রমিক সুরক্ষার সামান্য ব্যবস্থাও কারখানাগুলিতে নেই। তুলোর সূক্ষ্ম তন্তু অনবরত উড়তে থাকে কারখানার বাতাসে। শ্বাসের মাধ্যমে ভিতরে চলে গিয়ে এগুলি শ্রমিকদের ফুসফুসকে আক্রমণ করে। অথচ একটি গিনিং কারখানাতেও এ থেকে বাঁচাতে শ্রমিকদের জন্য মুখোশের ব্যবস্থা নেই। ফলে শ্রমিকরা 'বাইসিনোসিস' নামক গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়। ফুসফুস সংক্রান্ত অন্যান্য রোগেও মারাত্মক ক্ষতি হয় মজুরদের। বহু সময়ই অদক্ষ এবং প্রশিক্ষণ না নেওয়া শ্রমিকদের দিয়ে, তাদের নিরাপত্তার দিকে সামান্যতম খেয়ালও না রেখে মেশিন সংক্রান্ত নানারকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হয়।

শ্রমিকদের সঙ্গে গিনিং কারখানার মালিকদের সম্পর্ক এতই সুমধুর যে, পাছে শ্রমিক সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনের খপ্পরে পড়ে মজুরদের ন্যূনতম প্রাপ্যগুলি দিতে হয়, তাই কারখানার খাতায় তাদের নামই নথিভুক্ত করা হয় না। 'রাফ' খাতায় নাম লেখা থাকে এবং তা থেকেই তাদের মজুরি ইত্যাদির হিসাব রাখা হয়। কারখানাগুলিতে মজুরদের ছুটির কোনও বন্দোবস্ত নেই। এমনকী অসুস্থতার কারণেও ছুটি নিতে পারেন না শ্রমিকরা। মজুরির ক্ষেত্রেও ন্যূনতম মজুরি আইন মানেন না গিনিং মিলের মালিকরা। অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য কোনওরকম আর্থিক সাহায্য করেন না তাঁরা।

রাজ্যের বাইরে থেকে যে মানুষগুলো কাজ করতে আসেন গিনিং কারখানায়, কেমনভাবে থাকেন তাঁরা? সাধারণত শ্রমিক বস্তিতে বাস করেন এই মজুররা। এক একটা ১০ ফুট বাই ১০ ফুট ঘরে ১৫-২০ জন গাদাগাদি করে থাকেন। শৌচাগারের কোনও ব্যবস্থা নেই বস্তিগুলিতে। স্নানের জন্য রয়েছে একটাই মাত্র জলের কল। নারী শ্রমিকদের স্নান করার জন্য ঘেরা জায়গার কোনও ব্যবস্থা নেই। নোংরা, দুর্গন্ধময় পরিবেশে আধা অন্ধকার ঘরে গাদাগাদি করে দিন গুজরান করতে বাধ্য হন শ্রমিকরা। ফলে অসুখ-বিসুখ তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এর সঙ্গে রয়েছে নারী শ্রমিকদের উপর যৌন নিপীড়ন। প্রায়শই কারখানার মালিক ও ম্যানেজারদের যৌন অত্যাচারের শিকার হতে হয় অসহায় নারী শ্রমিকদের। রাজ্যের বহু মানুষ মনে করেন, ভিন রাজ্যের মহিলা মজুরদের গিনিং মিলে কাজ দেওয়ার পিছনে মালিক-ম্যানেজারদের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, এদের দিয়ে নিজেদের কদর্য লালসা মেটানো।

শুধু গিনিং শিল্প নয়, গুজরাটের বিখ্যাত হিরে শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থাও একই রকম করুণ। অন্যান্য শিল্পেও শ্রমিকদের অবস্থা একইরকম।

এই হল নরেন্দ্র মোদি কথিত গুজরাটের মালিক-শ্রমিক সখ্যের আসল চেহারা। সেখানকার মালিক-ম্যানেজারদের দৌলতে তাঁদেরই 'পরিবারের সদস্য' শ্রমিকদের এভাবেই দুর্বিষহ জীবনের বোঝা বয়ে চলতে হয়। অথচ নরেন্দ্র মোদির সরকার নির্বিকার। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তিনি নিজেই নিজের ঢাক পিটিয়েছেন। বলেছেন, তাঁর সরকার 'প্রো পিপল' অর্থাৎ মানুষের পক্ষে এবং তাঁর লক্ষ্য রাজ্যের মানুষকে 'গুড গভর্ন্যান্স' অর্থাৎ সুশাসন দেওয়া। তাই যদি হবে, তাহলে গিনিং শিল্পে কর্মরত দরিদ্র শ্রমিকদের এমন চূড়ান্ত শোষণের, বঞ্চনার শিকার হতে হয় কেন? কেন শাস্তি পায় না পদে পদে শ্রম আইন ভঙ্গকারী মুনাফালোভী লুটেরা মিল মালিক ও তাদের তাঁবেদাররা? নরেন্দ্র মোদির সরকার আসলে কাদের পক্ষে, গিনিং শিল্পের শ্রমিকদের করুণ কাহিনী জানার পর তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাঁর বহুল প্রচারিত 'সুশাসন' মালিকদের পক্ষে শুভ হলেও খেটে খাওয়া মানুষদের পক্ষে কার্যত 'অপশাসন' ছাড়া যে কিছুই নয়, তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পেট্রলের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৭ মে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ে বিক্ষোভ

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রাঁচিতে গণআদালত

বেআইনি দখলদারি উদ্ধারের নামে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও বিজেপি জোট সরকার রাঁচি, ধানবাদ, জামশেদপুর, বোকারো সহ ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে। এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে 'বস্তি বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি'। ৬ বছর আগে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। গত এপ্রিলে সরকার রাঁচিতে বস্তি উচ্ছেদ করতে গেলে বস্তিবাসীরা বাধা দেয় এবং পুলিশের গুলিতে দু'জন আন্দোলনকারী মারা যায়। এরপর আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়। ১৪ এপ্রিল রাঁচিতে ২৫ হাজার মানুষ মিছিল করে রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দিয়ে উচ্ছেদ বন্ধ রাখার আবেদন জানায়। আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে ঝাড়খণ্ড সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। এসব উপেক্ষা করেই ২ মে রাঁচিতে বস্তি বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় সামাজিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী মেধা পাটকর উপস্থিত হন এবং বস্তিবাসীদের জমির মালিকানা দেওয়ার দাবি জানান। আন্দোলনের চাপে উচ্ছেদ অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত হয়।

বস্তি বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি আন্দোলন জারি রেখেছে। ২২ মে রাঁচিতে সমিতির উদ্যোগে গণআদালত অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জুরির ভূমিকা নেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মধুকরজী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ রমেশ সরন, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ শিবনাথ মজুমদার। উচ্ছেদের পক্ষে সরকার পক্ষের উকিল এস কে দুবে বলেন, কোর্ট বেআইনি দখলদারি উচ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়েছে, সরকার এটা কার্যকর করতে বাধ্য। তা ছাড়া সরকার একটি পুনর্বাসন নীতিও নিয়েছে। এই যুক্তি খণ্ডন করে বস্তি বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতির বিশিষ্ট আইনজীবী সুমিত রায় বলেন, বাঁচার অধিকার, জীবনের অধিকার, আশ্রয়ের অধিকার হল প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত হল কাউকে উচ্ছেদ করার আগে তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের কর্মচারীদের বসবাসের জন্য কোয়ার্টারের স্বল্পতার কারণে কোম্পানি ২২টি গ্রামে এবং বস্তিতে জমি দিয়েছিল বাসস্থান নির্মাণের জন্য। কর্পোরেশনের নির্মাণ কাজের জন্য যে শ্রমিকদের আনা হয়েছিল বা অন্যান্য কাজে যারা যুক্ত ছিল তাদেরকেও জমি দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানির অনুমতি সাপেক্ষেই মৌসিবাড়ি, জগন্নাথপুর, নয়া কলোনি, ভুসুর, দারকাকোচা প্রভৃতি এলাকায় বস্তি গড়ে ওঠে। ৫০-৬০ বছর ধরে এই এলাকায় তাঁরা বসবাস করছেন। ফলে মানবিক কারণেই এই জমির মালিকানা তাঁদের পাওয়া উচিত। আইন মোতাবেকও ঐ জমির উপর তাঁদের অধিকার রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কোনও কথা না বলেই উচ্ছেদের জন্য চরমপত্র দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকারের কোনও পুনর্বাসন নীতি নেই। ইতিপূর্বে যাঁরা উচ্ছেদ হয়েছেন আজও তাদের পুনর্বাসন হয়নি। এঁদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিছু ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বার্থে, জমি মাফিয়াদের স্বার্থে। ফলে এই নোটিশ চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী।

সাক্ষী তেজুয়া পাহান বলেন, এইচ ই সি ম্যানেজমেন্ট আমাদের জমি দখল করে নিয়ে এখন আমাদেরই বলছে বেআইনি দখলদার। এ জিনিস আমরা সহ্য করব না। সাক্ষী শিলা দেবী বলেন, আমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতারিত করে ম্যানেজমেন্ট জমি নিয়েছে। কোনওভাবেই আমরা জমি ছাড়ব না।

অপর সাক্ষী আশ্রিতা খালখো বলেন, জন্মের পর থেকে এখানেই আমরা বাস করছি। কেউ আমাদের বলেনি বেআইনি দখলদার। আইনে আছে, ২০ বছর বসবাস করলে সেই স্থানের উপর বসবাসকারীর অধিকার জন্মায়। আমরা কোনওভাবে বেআইনি দখলদার নই।

তিন ঘণ্টা ধরে সহস্রাধিক লোকের সামনে প্রকাশ্যে শুনানি হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে জুরিগণ বস্তি বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতির পক্ষে রায় দেন। জুরিগণ বলেন, এখানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বৈধ রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। এদের বসবাসকে অবৈধ বলা যায় না। জুরিগণ আরও বলেন, এদের জমির মালিকানা দেওয়া দরকার এবং এটি একটি মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার।

কয়েক হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের উপস্থিতিতে গণআদালত। ডানদিকে জুরিরা।

ভারতে ১০ কোটি মানুষ উচ্ছেদের মুখে

ভারতের ১৭টি রাজ্যের ৪০টি জেলায় প্রায় ৪ লক্ষ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের তোড়জোড় চলছে। এর ফলে কৃষক, খেতমজুর সহ প্রায় ১০ কোটি সাধারণ মানুষ উচ্ছেদের মুখে। বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যে মন্দার ধাক্কা এসেছে তার হাত থেকে সাময়িকভাবে হলেও বাঁচতে পুঁজিপতিরা আবাসন ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে। এদের সস্তায় জমি দিতে সরকার জনস্বার্থের নামে ব্রিটিশ আমলের জমি অধিগ্রহণ আইন প্রয়োগ করে অত্যন্ত কম দামে কৃষকের জমি জোর করে কেড়ে নিচ্ছে। শুধু আবাসন নির্মাতাদেরই জমি দিচ্ছে তা নয়, মালিকদের মুনাফার স্বর্গরাজ্য 'সেজ' গঠন করতেও তাদেরকে হাজার হাজার একর জমি দেওয়া হচ্ছে। শুধু দেশীয় কোম্পানিকেই নয়, বিশ্বায়নের খোলাপথে আসা বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরকেও জমি দেওয়া হচ্ছে। সরকার নিজেও কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে জমি কিনে অনেকগুণ বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা করছে। এই সামগ্রিক মুনাফা চক্রের বলি ভারতের ১০ কোটি সাধারণ মানুষ। যে দলগুলি নির্বাচনের মুখে জনগণের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে নিজেদের জাহির করে, কাজের মানুষ কাছের মানুষ হিসাবে তাদের নেতাদের তুলে ধরে সেই কংগ্রেস, বিজেপি, বিএসপি, বিজেডি সরকারগুলিই এই উচ্ছেদ যজ্ঞের হোতা।

কোন কোন রাজ্যে কোন কোন জেলায় এই উচ্ছেদ চলছে তার সারণি নিম্নরূপ।

রাজ্য	জেলা	জমির পরিমাণ (একর)
১। উত্তরপ্রদেশ	আগ্রা, আলিগড়, চনদোলি, গৌতমবুদ্ধ নগর	১,৭৬,৩৩৬
২। মহারাষ্ট্র	নাগপুর, রায়গড়, রত্নগিরি, পুনে	৪৫,৬০০
৩। ছত্তিশগড়	বস্তার, জাঞ্জগীর-চম্পা	৪২,০৬৩
৪। ওড়িশা	জগৎসিংহপুর, জাজপুর, কালাহান্ডি, গঞ্জাম	৪১,৮০০
৫। ঝাড়খণ্ড	খুন্তি, গুমলা, হাজারিবাগ	২১,০০০
৬। গুজরাত	ভাবনগর, কচ্ছ	৬,৫২৯
৭। হিমাচল প্রদেশ	কুল্লু, কিন্নৌর, শ্রীমৌর, চম্বা	২,৮১৭
৮। বিহার	ঔরঙ্গাবাদ, মুজফফরপুর	১,৭৪৪
৯। হরিয়ানা	ফতেহাবাদ	১,৫০০
১০। পাঞ্জাব	মোহালি	৭৭০
১১। চণ্ডীগড়	—	১৬৭
১২। মেঘালয়	ইস্টখাসি	১১১
১৩। কেরালা	কোচি	১০০
১৪। অন্ধ্রপ্রদেশ	পূর্ব গোদাবরী, মাহবুবনগর, শ্রীকাকুলাম, নেলোর, বিশাখাপট্টনম	২১,৭৩৯
১৫। তামিলনাড়ু	মাদুরাই, থিরুভল্লুর, তুতিকোরিন,	৫,০০০
১৬। কর্নাটক	ডি, কান্নাডা	১৮০০
১৭। আসাম	—	—

(তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৩-৫-২০১১)

দলের প্রবীণ সংগঠকের জীবনাবসান

বীরভূম জেলার নেতৃস্থানীয় সংগঠক কমরেড বৈদ্যনাথ মাল সেপ্টিসেমিয়া এবং কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে সংকটজনক অবস্থায় ২৫ এপ্রিল ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি হন। চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁর শারীরিক অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়, কিন্তু ১৭ মে ভোরে অকস্মাৎ প্রবল হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

হাসপাতালে তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন দলের নেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী, হাসপাতালের মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ অশোক সামন্ত, অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর পক্ষে কমরেড অনিতা মুখার্জী, বিপিটিএ-র পক্ষে কমরেড বাণী মুখার্জী, দলের হাওড়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত, প্রয়াত কমরেডের দুই পুত্র এবং দলের বীরভূম জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক সহ অনেকেই। তাঁর মরদেহ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আনা হয়। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষ, কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোরা গুপ্ত। তারপর তাঁর মরদেহবাহী গাড়ি বীরভূমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সিউড়ী, মল্লারপুর, রামপুরহাট, ঝাড়গ্রাম, বসোয়া পাতনা এবং তাঁর নিজ গ্রাম পোড্ডায় পৌঁছানোর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অনেকেই গভীর শোক এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরদিন বৈপ্লবিক মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

দিনমজুর পরিবারের সন্তান কমরেড বৈদ্যনাথ মাল কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সমাজের অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কাজ করতেন। সেই সূত্রে ১৯৭২ সালে রামপুরহাট এলাকায় দলের সংগঠক কমরেড মনসুর আমেদ-এর মাধ্যমে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন। এলাকায় খাসজমি উদ্ধার, খেতমজুর, গরিব চাষি, ভাগচাষি, বর্গাদারদের নিয়ে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে, তিনি অনেক মানুষের প্রিয়জনে পরিণত হন এবং দলের ভিত্তি গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পড়াশুনা, জ্ঞানচর্চার প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল তাঁর। কর্মীদেরও সেভাবে শিক্ষিত করার চেষ্টা করতেন। দলই জীবন, এই কঠোর কঠিন সংগ্রামে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং পরিবারকেও দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করে গেছেন। প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতার কাজ তাঁর পার্টির দায়িত্ব পালনে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

কমরেড বৈদ্যনাথ মাল-এর আকস্মিক মৃত্যুতে দল হারাল এক বলিষ্ঠ সংগঠককে, আর গরিব মানুষ হারাল তাদের প্রিয়জনকে।

কমরেড বৈদ্যনাথ মাল লাল সেলাম

বহুজাতিক সংস্থার কাছে কৃষি ও খুচরো ব্যবসার দরজা খুলে দেওয়ার প্রতিবাদ

একের পাতার পর

দেবে যা জনগণের পকেটের শেষ কপর্দকটুকুও কেড়ে নিয়ে তাদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলবে। তাছাড়া, এই নতুন প্রস্তাব লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ধ্বংসসাধনকে ত্বরান্বিত করবে, অসংখ্য কর্মচারীও কাজ হারাবে। এই প্রক্রিয়ায় অসংখ্য দরিদ্র ক্ষুদ্র ও মধ্য চাষি জমির স্বত্ব হারাবে, যা নিশ্চিত রূপে তাদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেবে। নয়া উদারনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে, যাতে দেশের কৃষিপণ্যের বাজারটি বিদেশি পুঁজিপতিদের সামনে খুলে দেওয়ার বিনিময়ে এই পুঁজিপতিরা আরও বেশি করে বিদেশের বাজারে ভাগ বসাতে পারে।

এই সর্বনাশা উদ্যোগ পরিত্যাগ করার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে সর্বস্তরের মেহনতি জনগণ এবং যথার্থ বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

বিহারে সরকার বদল হল, জনগণের অবস্থার বদল হল না কেন

পাটনায় পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় কমরেড রণজিৎ ধর

এস ইউ সি আই (সি)-র ৬৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৪শে এপ্রিল পাটনার আই এম এ হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিউশঙ্কর, প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ কুমার সিং। প্রস্তাবে বিহার রাজ্যে বিদ্যুৎ, পরিবহন সহ নানা জনপরিষেবা বেসরকারিকরণের সরকারি পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

কমরেড রণজিৎ ধর তাঁর ভাষণে বলেন, আজ আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে দলের বিহার রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রথমেই যে কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, তা হচ্ছে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের পরিচয় দেয় এমন অনেক দল আমাদের দেশে থাকা সত্ত্বেও কমরেড শিবদাস ঘোষ কেন এস ইউ সি আই (সি) দলটি গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছিলেন।

প্রথমত দল কাকে বলে? দল হল শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীর হাতে তার শ্রেণী উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার। আমাদের দেশের হাতে গোনা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিগোষ্ঠী কোটি কোটি গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর যে অবাধে শোষণ লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা চালিয়ে যাচ্ছে কী করে? চালিয়ে যাচ্ছে তারা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে হস্তগত করে।

কমরেড ধর বলেন, পরাধীন যুগে ইংরেজ কী করে দীর্ঘ দুশো বছর এদেশে শাসন এবং শোষণ চালিয়েছিল? কী ছিল তাদের হাতিয়ার? তারা মিলিটারি, বিচারব্যবস্থা, পুলিশ ও আমলাতন্ত্র মিলিয়ে নিজ স্বার্থের অনুকূলে একটা ধাঁচা বা রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপন করেছিল। তার সাহায্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশ দখল করে শোষণ চালাত, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমশক্তি লুঠ করত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই দেশ ধনী ও গরিব এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এটা ঘটনা নয় যে, দেশ আজ শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে। এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যেমন শোষিত মানুষ লড়েছে, সামনাসামনি মাঠে ময়দানে লাঠি-গুলির মুখে দাঁড়িয়ে না লড়লেও মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরাও সেই লড়াইয়ের পক্ষে ছিল। কিন্তু, এই দুই শ্রেণীর সামনে লড়াইয়ের লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে দেশের আপামর সাধারণ মানুষ চাইছিল সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি, আর মালিকরা চাইছিল, যে রাষ্ট্রযন্ত্রটির সাহায্যে ব্রিটিশরা এ দেশে লুটের রাজত্ব কায়েম করেছে, সেই রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে হস্তগত করাতে ও ব্রিটিশের পরিবর্তে নিজেদের নিরঙ্কুশ লুটের রাজত্ব কায়েম করাতে। পুঁজিপতিদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কারণ ভারতীয় পুঁজিপতিদের শ্রেণীউদ্দেশ্য পূরণের জন্য ছিল তাদের নিজস্ব শ্রেণীদল। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অকুতোভয়ে লাঠি-গুলির সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিল, সর্বস্ব দিল, সেই কোটি কোটি সাধারণ মেহনতি মানুষের নিজস্ব প্রকৃত শ্রেণীদল ছিল না।

দেখুন পার্টির গুরুত্ব কী বিশাল। পার্টি ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়। মালিকরা নিজেদের পার্টির মদতেই লুঠের রাজত্ব কায়েম রেখেছে। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে কংগ্রেসকে হঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে জনতা পার্টি এসেছে, তারপর বিজেপি এসেছে, আবার কংগ্রেস আবার বিজেপি ঘুরে ঘুরে এসেছে, কিন্তু গরিবের অবস্থা যা ছিল তা-ই থেকেছে। বিহারে লালুপ্রসাদের রাজত্বে যা ছিল, নীতীশ কুমারের রাজত্বে কি তার কোন পরিবর্তন হয়েছে? মূল্যবৃদ্ধির কোনও রদবদল হয়েছে কি? চাষি ফসলের দাম পাচ্ছে কি? সার বীজ চাল গম সস্তাদরে পাওয়া যাচ্ছে কি? কাজকর্ম জুটছে কি? পরিবারের খাওয়া-পরা চলার মতো মজুরি মিলছে কি? সরকারের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু মানুষের জীবনমানের কোনও পরিবর্তন আসছে না। এর কারণ কী? এইখানেই আসছে গরিব মানুষের নিজের সঠিক পার্টিকে চিনে নেওয়ার প্রশ্নটি। যদি আপনারা নিজেদের শ্রেণীর সঠিক দলটিকে চিনে নিতে না পারেন, যদি সেই পার্টিকে শক্তিশালী না করে তোলেন, তা হলে পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন খতম করে গরিব-মেহনতি মানুষের শাসন কায়েম করবেন কী করে? যদি আপনার নিজস্ব শ্রেণীদল নেতৃত্বে না থাকে, তা হলে কে আপনাকে সঠিক পথ দেখাবে? কে আপনাকে নেতৃত্ব দেবে? আমাদের দেশের মানুষ অতীতে কম লড়েনি, লড়াই এ দেশে অনেক হয়েছে, বহু মানুষ লাঠি-গুলির মুখে বুক পেতে দিয়েছে, বহু পরিবার শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সঠিক পার্টির নেতৃত্ব না থাকায় আমরা এক ইঞ্চিও এগোতে পারিনি শুধু নয়, আমরা কেবল পিছিয়েছি। কারণ, ঐ সমস্ত আন্দোলনে সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর দলের নেতৃত্ব ছিল না। সেজন্য পার্টির প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে মার্কসবাদ লেনিনবাদের নাম নিয়ে চলা দলের অভাব নেই। সি পি আই, সি পি আই (এম), আর এস পি, বলশেভিক পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি সব দলই মার্কসবাদের কথা বলে। এসব দল থাকতেও দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে দেশের ক্ষমতা পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে চলে গেল কী করে? কারণ শোষিত মানুষের মুক্তি অর্জন করতে হলে যে বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটা সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর দল গড়ে উঠতে পারে এসব দল সে ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেনি। কিছু লোক একজোট হলেই একটা পার্টি হয়ে যায় নাকি? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে কিছু স্লোগান দিলেই, আর লাল ঝান্ডা ওড়ালেই তা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হয় না। বিষয়টা এমন নয় যে যাঁরা ওই সব দল গড়ে তুলেছিলেন তাদের মধ্যে সততা ছিল না, কিন্তু যে বিশেষ ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটা সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গড়ে উঠতে পারে সেই প্রক্রিয়া তাঁরা গ্রহণ করেননি।

কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন দেখলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অগণিত মানুষের আত্মদানের সুফল আত্মসাৎ করছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণী, তখন তিনি উপলব্ধি করেন এ দেশে আর একটি বিপ্লবের জন্য একটি সঠিক সর্বহারা শ্রেণীর দল গড়ে তোলা দরকার। সর্বহারা শ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী দল ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয় এই উপলব্ধির ভিত্তিতে একটা সঠিক সর্বহারা বিপ্লবী দলগঠনের প্রয়োজন বুঝে কমরেড শিবদাস ঘোষ লেনিনীয় পদ্ধতিতে জীবনের সর্বদিককে ব্যাপ্ত করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই (সি) দল গঠন করেন এবং পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সঠিক রাজনৈতিক লাইন প্রণয়ন করেন। তিনি দেখান, এই রাজনৈতিক লাইনের প্রাণসত্তা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক সংস্কৃতিসম্পন্ন চরিত্রগঠন। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিলেই বিপ্লব হবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ শিখিয়েছেন সকল চিন্তা সকল দর্শন সমস্ত বিচারধারার মূল হল তার সংস্কৃতি। একমাত্র বিপ্লবী সর্বহারা সংস্কৃতির আধারেই সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র গড়ে উঠতে পারে।

ব্যক্তি সম্পত্তি ও ব্যক্তিমালিকানার আধারে গঠিত পুঁজিবাদী সমাজ হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ। এ সমাজ শেখায় সর্বপ্রথম নিজের কথা ভাবো, তারপর অন্যের কথা, সমাজের কথা।

পুঁজিবাদ হল ব্যক্তিমালিকানা, অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে মালিকদের মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি সামাজিক ব্যবস্থা। আর সমাজতন্ত্র হল সামাজিক মালিকানা, অর্থাৎ উৎপাদনে সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সামাজিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি সামাজিক ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কারখানায়, বাগিচায়, খনিতে সর্বত্র উৎপাদন হচ্ছে মুনাফার জন্য। খাদ্য-শিক্ষা-বাসস্থান-চিকিৎসা সবকিছুই গরিব মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই আপনার পরার কাপড় জুটুক আর না জুটুক, মালিকের মুনাফার কড়ি জুগিয়ে কাপড় কেনার পয়সা যদি আপনার পকেটে না থাকে তবে আপনাকে কাপড় ছাড়াই থাকতে হবে। এ সমাজে যদি কেউ না খেয়ে মরে তার খোঁজ নেওয়ারও কেউ থাকে না। এখানে গরিব ঘরের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করার সুযোগ থাকে না, কারণ তাদের পয়সা নেই। সরকার তাদের জন্য কিছু করবে না। সরকার কর নেবে হাজার হাজার কোটি টাকা, খরচ করবে মালিকদের জন্য। কিন্তু গরিব মানুষের জন্য কিছু করবে না। কারণ এই সরকার মালিকদের সরকার, গরিবের সরকার নয়।

সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে পুঁজিবাদ যেদিন এসেছিল সেদিন বিপ্লবী পুঁজিবাদ সমাজের বহু অগ্রগতি ঘটালেও আজ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ সমাজকে কিছু দিতে পারে না। আজ মানুষের জীবনের সমস্ত সমস্যার মূলে আছে পুঁজিবাদ। মজুরের কাজ নেই, শিশু-কিশোরের শিক্ষা নেই, পরিবার প্রতিপালন করতে না পেরে চাষি আত্মহত্যা করছে। পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে এসব সমস্যার সমাধান করা যাবে না। যে সমাজে স্নেহ নেই, মমতা নেই; যে সমাজে মানুষ পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম, সেই সমাজের টিকে থাকার কোনও অধিকার নেই। কাজেই আমাদের লড়াইয়ের পথে আসতে হবে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াই। সকলকে জাগাতে হবে। অন্যায়ের বনিয়াদের ওপর টিকে থাকা এই সমাজকে খতম করতে হবে। এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পার্টিকে শক্তিশালী করতে হবে। সমাজতন্ত্রে সর্বস্তরের মানুষের কী বিস্ময়কর উন্নয়ন হতে পারে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তা দেখিয়েছে। কিন্তু তারা সমাজতন্ত্রকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি। এর কারণ, সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে সর্বহারা সংস্কৃতির পরিবর্তে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বা তার প্রভাব অবলুপ্ত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল সোভিয়েতে। যদি সমাজতন্ত্রে সামাজিক মালিকানার অনুকূল সংস্কৃতি সৃষ্টি করা না যায়, তবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যক্তিবাদী পুঁজিবাদী মানসিকতা প্রাধান্য পেতে থাকবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও পুরনো সমাজচিন্তার অবশেষ ছিল, লেনিন ও পরবর্তীকালে স্ট্যালিনের সময় মাথা তুলতে না পারলেও স্ট্যালিন পরবর্তীকালে যা শেষ পর্যন্ত বাড়তে বাড়তে সমাজতন্ত্রকে বিপন্ন করেছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই (সি)'র সাথে যুক্ত হয়ে যাঁরা বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের সর্বহারা সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করতে হবে। আমরা ঘরেই থাকি বা পার্টি সেন্টারেই থাকি, চিন্তাপ্রক্রিয়া থেকে আমাদের ব্যক্তিবাদ দূর করতে হবে। সামগ্রিক স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ করা, যৌথ সিদ্ধান্ত আনন্দের সাথে মেনে নেওয়া, ব্যক্তিচিন্তার দ্বারা পরিচালিত না হওয়া — এই মানসিকতা অর্জন করার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

আগে তথাকথিত কমিউনিস্ট নামধারী সি পি আই, সি পি আই (এম)-এর মার্কসবাদবিরোধী চালাকির কথা মানুষকে ধরানো যেত না। এদের প্রতি জনগণের যেটুকু মোহ ছিল পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ বছর শাসনের পর তা নিঃশেষের পথে। সি পি আই এবং সি পি এম যে কমিউনিস্ট নয়, এ কথা আজ আর প্রমাণ করে দেখাতে হয় না। বহুদিন আগেই কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, তথাকথিত মার্কসবাদীদের কাজ হল জনগণকে ধোঁকা দেওয়া। এরা মজুর ঠকাতে বাইরে মালিকের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করে, আবার মালিকের টাকায় সংগঠন চালায়। পুঁজিপতিদের মদতে পুঁজিবাদী মিডিয়ার প্রচারের আলো এদের ওপর পড়ে। তা সত্ত্বেও এদের প্রতি জনগণের মোহ ভাঙছে। মিডিয়ার প্রচার না পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ ক্রমেই বুঝতে পারছে একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলই তাদের মুক্তির সঠিক পথ দেখাতে পারে।

বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম মাওবাদীদেরও বিরাট প্রচার দেয়। তা দেখে ভাববেন না যে এরা খুব শক্তিশালী। সারা ভারতে ক'টি রাজ্যে তাদের কাজ বিস্তৃত? হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্যে তাদের কাজ। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র আর ছত্তিশগড়ের কিছু অংশে তাদের কাজ। মাও সে-তুংয়ের নাম নিয়ে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জঙ্গলে থেকে কিছু ব্যক্তিহত্যার দ্বারা বিপ্লব সম্ভব নয়। কমিউনিস্টরা ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি করে না। তারা একটি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে অন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। মাও সে-তুংয়ের নাম তারা যতই নিক, ভারতের পরিস্থিতি আর চীনের পরিস্থিতি এক নয়। তাই চীনের রাস্তায় ভারতে বিপ্লব হবে না। এটা বুঝেই বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম অকৃপণভাবে ওদের প্রচার দিচ্ছে। ভারতে বিপ্লব হবে কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্দেশিত পথে।

বিপ্লবের জন্য দেশে আজ সব ধরনের জমি তৈরি, বিপ্লবী দলও আছে। কিন্তু উপযুক্ত শক্তির অভাব। তাই আজ সর্বশক্তি দিয়ে পার্টিকে শক্তিশালী করতে হবে। পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য এত অনুকূল পরিস্থিতি আগে কখনও আসেনি।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবাংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এস ইউ সি আই (সি) দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ সেই দল গোটা ভারতের রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের শক্তি প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও আজ আর নগণ্য নয়। এই বিহার রাজ্যেও আমাদের বিকাশের সম্ভাবনা প্রবল কিন্তু আমাদের দুর্বলতা হল এজন্য আমাদের প্রত্যেকের যে সময় দেওয়া দরকার তা আমরা দিতে পারছি না। দলের সর্বস্তরের নেতাদের অন্তত জীবন এমন হওয়া দরকার যে, পার্টির চিন্তাই তাঁদের মনকে চব্বিশ ঘণ্টা ছেয়ে থাকে। জলের মধ্যে মাছের মতো তাঁদের সর্বদা জনগণের মধ্যে থাকা দরকার। জনগণের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা, বিপ্লবের কাজে সর্বক্ষণ আত্মনিয়োগ করা এবং সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামে নিরন্তর যদি আমরা ব্যাপৃত থাকতে পারি তবেই পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন সার্থক হবে।

সমাজতন্ত্র হারিয়ে রাশিয়ার জনগণ কী পাচ্ছে

ময়দা কল শ্রমিকদের দাবি আদায়

রাশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পসংস্থা 'পাভা'র অন্তর্গত মিখাইলভস্কি ময়দা কলের শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সাথে বেতনবৃদ্ধির চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। শ্রমিকদের স্ট্রাইক কমিটির চেয়ারম্যান ভ্লাদিস্লাভ টাসনাভিল বলেছেন, ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা যে ঐক্য-সংহতি গড়ে তুলতে পেরেছিল, তার জন্যই মালিকরা বেতনবৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে।

বকেয়া মজুরির দাবিতে ধর্মঘট

চেলিয়াবিনস্ক কনফেকশনারি ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা গত দু'বছর ধরে তাদের ছুটির দিনের জন্য প্রাপ্য মজুরি পাচ্ছে না। এর প্রতিবাদেই তারা ধর্মঘটে যায়। কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করে। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন ঐ ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে। এই কোম্পানির মালিক হচ্ছে একটি রুশ ব্যাঙ্ক।

আর্ট কলেজে সরকারি অনুদান হ্রাস, বিক্ষোভে ছাত্ররা

পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত, বর্তমানে পৃথক রাষ্ট্র লাটভিয়ার সংস্কৃতি মন্ত্রকের বিরুদ্ধে রাজধানী রিগার পথে বিক্ষোভ দেখাল ছাত্ররা। উচ্চশিক্ষায় ও আর্ট কলেজগুলিতে সরকার যে অর্থসাহায্য দেয় তা বন্ধ করার নির্দেশের প্রতিবাদে ছাত্ররা রাস্তায় নামে। তাদের মিছিলের ব্যানারে লেখা 'উচ্চশিক্ষা থেকে হাত ওঠাও' 'সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে সরকারি আর্থিক অনুদান বন্ধ করা চলবে না।' ছাত্রদের এই মিছিলে বিভিন্ন সংগঠন ও আন্দোলনের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। অ্যাসোসিয়েশন অফ লাটভিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস-এর পক্ষ থেকেও এই বিক্ষোভে প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল। এই প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেছিল লাটভিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস, লাটভিয়ান অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক ও লাটভিয়ান অ্যাকাডেমি অফ কালচারের ছাত্ররা।

প্রতিবাদী ছাত্রদের তথ্য সংগ্রহ করছে রুশ প্রশাসন

সেন্ট পিটার্সবার্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদী ছাত্রদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য — কারা কোন সংগঠন করে, বিক্ষোভ মিছিল বা সভায় যায় কি না, কোন রাজনীতির সাথে যুক্ত ইত্যাদি সংগ্রহ করছে সংরক্ষণ করার জন্য।

রাশিয়ান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই কাজ দেশের সংবিধানবিরোধী। রাশিয়ার সংবিধানে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে, কারও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোনও তথ্য বা সংবাদ ঐ ব্যক্তির অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া প্রকাশ কিংবা প্রচার করা যাবে না।

কর্তৃপক্ষ এক নোটিশে ছাত্রদের আদেশ দেয়, প্রত্যেককে লিখিতভাবে জানাতে হবে, সে কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত, কোন মিছিল বা বিক্ষোভে সে অংশ নিয়েছে। নোটিশ থেকেই কর্তৃপক্ষের মতলব ফাঁস হয়ে যায়, ছাত্ররা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এই হচ্ছে পুটিনের রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক অধিকারের নমুনা। (সূত্র ঃ নর্থস্টার কম্পাস, এপ্রিল সংখ্যা)

সমাজতন্ত্রে নারীমুক্তি সরকারের নীতিরই অঙ্গ ছিল

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে প্রচার চলছে। যাঁরা এই প্রচার করছেন তাঁরা অনেকেই জানেন না সমাজতন্ত্র কী এবং মানুষকে তা কী দিয়েছিল। আমরা এখানে তুলে ধরছি সোভিয়েত রাশিয়ার ইউক্রেনের এক মহিলার কথা। ২৬ বছর বয়সী এই মহিলা ল্যুডমিলা পোগোরেলভা, যাঁর শৈশবের ৭ বছর কেটেছে সমাজতন্ত্রে, পরের ১৯ বছর পুঁজিবাদে। জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি চিনতে পেরেছেন সমাজতন্ত্র না পুঁজিবাদ — কোনটি অধিকতর শ্রেয়।

তিনি বলেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন নারীদের অধিকার এবং বাক স্বাধীনতা প্রদানে গোটা বিশ্বের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সফল হয়েছিল। রান্নাঘরের বদ্ধ কুঠুরি থেকে সমাজজীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসায় এখানে উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সেইসময় রাশিয়ার কর্মক্ষম পুরুষদের প্রায় অর্ধেকই চলে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে এবং পরে তারা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হিসাবে দেখা দেয় বিভিন্ন কারখানায়, প্ল্যান্টে, অফিসে কাজ করার জন্য অতিরিক্ত শ্রমশক্তির। শিশু সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নারীরা সেই সময় রান্নাঘর ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সেই কাজে যোগ দিয়েছিল।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র শুরুতেই নারীদের দিয়েছিল ভোটাধিকার, দিয়েছিল পুরুষের সমান মজুরি, দিয়েছিল মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা। শিশু, নারী ও মাতৃত্বের সুরক্ষায় এবং সামগ্রিক কল্যাণে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে কমিউনিস্ট পার্টির নারী নেত্রী ও কর্মীরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

পুঁজিবাদী দেশগুলির নারীমুক্তির ধারণার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নারীমুক্তির ধারণায় রয়েছে বিস্তর প্রভেদ। সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনও নারীবাদী আন্দোলনের প্রয়োজন হয়নি, কারণ নারীমুক্তি সমাজতান্ত্রিক সরকারের নীতিরই অঙ্গ ছিল এবং তা প্রতিষ্ঠিত ছিল নারী পুরুষের সমতার ধারণার উপর। কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী ইউক্রেন বা রাশিয়ায় নারীদের পুরনো নিয়মের জাঁতাকলে পড়তে হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট নীতি ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং নারী ও পুরুষ ছিল সমান সুযোগের অধিকারী।

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে বিনিয়োগকারীরা মেয়েদের কম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে এবং পুরুষের চেয়ে কম বেতন দেয়। কিন্তু সমাজতন্ত্র নারী-পুরুষের পূর্ণ সমতার কথা বলে এবং সম বেতন দেয়।

শিশুদের প্রাক-স্কুল পরিচর্যা, কে জি স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশুনা, চিকিৎসা সবই সমাজতন্ত্রে পাওয়া যেত বিনামূল্যে। শুধু শিশুদেরই নয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রত্যেককে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অধিকাংশ মহিলা তাঁদের চাকরি হারান। তীব্র বেকারত্বের জ্বালায় অনেকে বেশ্যাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হন। অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেন এখন ব্যক্তিগত মালিকানায়। সেখানে শিশুদের পরিচর্যা ও শিক্ষা খুবই ব্যয়বহুল। শিক্ষার মান ভয়াবহভাবে নেমে গেছে। যুবকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। কারণ তাদের সামনে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। খাওয়ার টেবিলে পরিবারের বাবা মা ভাই বোনদের জন্য রুটির সংস্থান করতে তারা অপারগ।

সমাজতন্ত্রের পতন সম্পর্কে গভীর ব্যথায় তিনি বলেন, একটা রাষ্ট্র গঠন করার চেয়ে ভাঙা অনেক সহজ। বিশ শতাব্দী ছিল পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রামের যুগ। ঘরশত্রু বিভীষণের মতো ভেতর থেকে সংশোধনবাদীরা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আর বাইরের শত্রুরা তাদের মদত দিয়েছে, অর্থ জুগিয়েছে এবং তার ফলেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছে। এই পতন সাময়িক

তিনি বলেন, ''আমি মনে করি, সোভিয়েত জনগণের অভিজ্ঞতা এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজতন্ত্র আবার মাথা তুলবে। সমস্ত মানবসমাজের ভবিষ্যৎ হল সমাজতন্ত্র।''

(সূত্র ঃ নর্থস্টার কম্পাস, এপ্রিল সংখ্যা)

এবার গণবিক্ষোভের ঢেউ স্পেনে

একের পাতার পর

যে, ঐ বিশাল গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছিল ফেসবুক টুইটারের সৌজন্যে। এ কথা ঠিক, আন্দোলনের সংগঠকরা এই নেটওয়ার্কগুলোর সাহায্য নিয়েছে, কিন্তু মূল কারণ তো দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সংকট। এমনিতেই যখন আর্থিক সংকটে সাধারণ মানুষ জেরবার, তখন আবার সরকার ঘোষণা করেছে সরকারের ব্যয় কাটছাঁট করা হবে। যার অর্থ, অপব্যয় রোধ নয়, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি অর্থসাহায্য কমানো। অর্থসংকটের কথা বলে জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় কমানো হচ্ছে। অথচ, বিশাল বিশাল ব্যাঙ্ক, যারা ফাটকা কারবার করে দেউলিয়া হয়েছে, তাদের উদ্ধার করার জন্য সরকারের অর্থের অভাব দেখা যায়নি। এই ঘটনাই স্পেনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের জনগণকে ক্ষিপ্ত করেছে।

সাংবাদিকতার ছাত্র সাবিনা ওর্তেগা, ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর (২০ মে) পত্রিকাকে বলেছে, ''আমি এই ব্যবস্থার (সিস্টেম) বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই এখানে এসেছি। ব্যাঙ্ক, সরকার, পিপলস্ পার্টি সব কিছুর আমি বিরুদ্ধতা করি। দেশে কোনও কিছুই ঠিক নেই।'' ''দেশে যে দুই দলের সংসদীয় ব্যবস্থা চলছে, আমি তার বিরুদ্ধে, সেখানে আমার প্রতিনিধিত্ব নেই। আমি চাই রাজনীতিকরা এসব জানুন, কিন্তু তাঁরা শুনছেন না। আমি যতদিন প্রয়োজন এই পার্কেই থাকব।''

পার্ক-ময়দান দখল করে এই ধরনের জমায়েতের উপর স্পেন সরকার ২০ মে, অর্থাৎ নির্বাচনের দু'দিন আগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু না মাদ্রিদ শহরে, না অন্যত্র, কোনও জনতা তা মানেনি, লাখে লাখে তারা জমায়েতে সামিল থেকেছে।

মাদ্রিদের পুয়েরতা দে সল-এ সমবেত জনতার মাঝে জায়গায় জায়গায় টাঙানো হয়েছে বিরাট বিরাট ব্যানার। তার একটিতে লেখা আছে — 'পুঁজিবাদই আসল সংকট' (লা ক্রাইসিস এস এল ক্যাপিটালিসমো)। এই বিক্ষোভ সমাবেশ চালাতে তৈরি করা হয়েছে নানা ক্যাম্প। কোথাও চিকিৎসার ব্যবস্থা, কোথাও আইনি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। দখল চালিয়ে যেতে হলে খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা চাই, তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই সাথে চলছে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক, আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মতবাদিক আলোচনা।

স্পেনের বিভিন্ন কমিউনিস্ট ও বামপন্থী সংগঠন '১৫ মে'র আন্দোলনের সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছে, সক্রিয়ভাবে এতে অংশও নিচ্ছে। তারা চেষ্টা করছে একদিকে প্রতিবাদী জনতার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা গড়ে তুলতে ও গভীর করতে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যয়সংকোচনের প্রতিবাদে নানা অংশের যে মানুষ জড়ো হয়েছে, তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, স্প্যানিশ রাষ্ট্র ও দুই শাসক দল — স্প্যানিশ সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি ও পিপলস পার্টির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের নেতৃত্বে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করা।

স্পেনের পরিস্থিতি

২২ মে'র নির্বাচনে স্পেনের সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি প্রবল ধাক্কা খেয়েছে পিপলস পার্টির কাছ থেকে। ১৯৭০-এর দশকের মধ্যভাগে ফ্যাসিস্ট শাসক ফ্রাঙ্কোর শাসন অবসানের সময় — যখন কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কার চালু করা হয় — তখন থেকে এই স্বঘোষিত সোস্যালিস্টরা যেসব জায়গায় জনসমর্থনের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল ও ধরে রেখেছিল এবার সেখানেও তাদের পরাজয় ঘটেছে।

দলের নাম সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি হলেও বাস্তবে এটি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছাড়া কিছুই নয়। স্পেনের সংসদীয় দুই পার্টি ব্যবস্থায় এই পার্টির ভূমিকা ব্রিটেনের লেবার পার্টি বা আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মতো। ১৯৭৯ সালে পার্টির বিশেষ সম্মেলন করে এরা মার্কসবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করে বুর্জোয়া শিবিরের সদস্যপদ পায় ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থার শরিক হয়ে যায়। অন্যদিকে পিপলস পার্টি হচ্ছে একেবারে চিহ্নিত দক্ষিণপন্থী, ১৯৮০ সালে এদের জন্ম। এদের নেতৃত্বের মধ্যে অনেকেরই একদা কুখ্যাত স্বৈরাচারী ফ্রাঙ্কোর সাথে যোগাযোগ ছিল, কেউ কেউ ফ্রাঙ্কোর অধীনে কাজও করেছিল।

স্পেনের অর্থনীতি আকারে বিশ্বের দ্বাদশ বৃহত্তম। আবার বাজেট ঘাটতির অঙ্কে ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম ঘাটতির দেশ। অবস্থা আজ এমন যে, স্পেন সরকার যদি ব্যাঙ্কগুলোর ঋণ মেটাতে না পারে, তাহলে আই এম এফ-এর ফরমানে তাকে ব্যয়সংকোচের প্যাকেজ গিলতে হবে আয়ার্ল্যান্ড, গ্রিস ও পর্তুগালের মতো।

দেশের প্রধান তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের মধ্যে একমাত্র সি জি টি ই এই ব্যয়সংকোচের রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অন্য দু'টি ফেডারেশন সরকারকে অনেক আগেই মুচলেকা দিয়েছে আন্দোলন না করার।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও বিশ্ব পুঁজিবাদের চলমান সংকট দেশের মানুষের জীবনে, যুব সম্প্রদায় ও শ্রমিকদের জীবনে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে এই আন্দোলন। নির্বাচন এল, চলেও গেল। বিক্ষোভে ভাটা পড়েনি, তা চলছেই। সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী জনতা চায় সঠিক নেতৃত্বে এই আন্দোলন সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করুক।

লালফৌজ ঃ সমাজতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় এক নাম

অন্যান্য বারের মতো এবারও ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বের সমাজতন্ত্রপ্রিয় মানুষ উদযাপন করলেন লালফৌজ গঠনের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের হাতে গড়া দলের শিক্ষায় শিক্ষিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই লালফৌজ, যা গোটা বিশ্বের মানুষের বিপুল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিল। লালফৌজের প্রতিটি সেনা, মাতৃভূমি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক-চাষির সরকারের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষার গুরু দায়িত্ব অর্পিত ছিল লালফৌজের প্রতিটি সেনার উপর। বিপ্লবের পর সে দেশে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বস্ত রক্ষক হিসাবে লালফৌজ তা সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব পালন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষা করা ছাড়া লালফৌজের সেনাদের কারওরই জীবনের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে লালফৌজের সেনারা প্রকৃত অর্থেই ছিল একাত্ম— তাদের আলাদা কোনও সত্তার অস্তিত্ব যেন ছিল না। জনগণের সঙ্গে এই একাত্মতা লালফৌজকে দিয়েছিল এক অপরাজেয় শক্তি। সমাজতন্ত্র যে নতুন যুগ প্রতিষ্ঠা করেছিল, লালফৌজের এক একজন সৈনিক যেন ছিল সেই নতুন যুগের প্রতিভূ। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের নতুন মানুষদের সর্বোচ্চ গুণাবলীরই প্রকাশ যেন ঘটেছিল তাদের মধ্যে। গৃহযুদ্ধের রক্তাক্ত অধ্যায়, জার্মান ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের এই বলশেভিক গুণগুলি আরও শাণিত হয়ে উঠেছিল।

মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য লালফৌজকে বহু লড়াই লড়তে হয়েছিল। কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি হয়েছিল দুর্জয় সব যুদ্ধাস্ত্র। বড় বড় শিল্প-কলকারখানা তৈরি হওয়ার দ্বারা সমস্ত ধরনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর সঙ্গে ছিল অসীম গুণাবলী সম্পন্ন সোভিয়েত সেনাদল। তাদের দুর্জয় সাহস, তীক্ষ্ণ প্রহরা, শৃঙ্খলাবোধ, স্থৈর্য ও বীরত্ব, সর্বোপরি মাতৃভূমির প্রতি সীমাহীন বিশ্বস্ততা— গোটা বিশ্বের মধ্যে তাদের করে তুলেছিল তুলনাহীন।

সোভিয়েত লালফৌজের যে সব সেনারা কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা কমিউনিস্ট যুব লিগের সদস্য ছিলেন, ফৌজ তাঁদের জন্য গর্ব বোধ করত। বিশ্বের আর কোনও সেনাদল লালফৌজের সৈনিকদের মতো এত শক্তিশালী ছিল না। তাদের মতো মাতৃভূমির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ আর কাউকে পাওয়া যায়নি। মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ নেওয়ার সময় লালফৌজের সেনারা প্রতিজ্ঞা করত —'আমার পিতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার জন্য শ্রমিক ও কৃষকের সরকার যখনই আমাকে এগিয়ে আসতে আদেশ করবে — সেই আদেশ পালন করার জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত'।

বিশ্বের কোনও পুঁজিবাদী দেশের সৈনিক এই শপথ নেয় না। আজকের পুঁজিবাদী রাশিয়ার সেনারা যে শপথ নেয় তার মধ্যে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্নতার সুরই ফুটে ওঠে।

লালফৌজের এই শপথের মধ্য দিয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিক সোভিয়েত নাগরিকদের ভাবনা ও আবেগ মূর্ত হয়ে উঠত। শত্রু আক্রমণ করেছে, এ কথা শোনা মাত্র সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের লক্ষ লক্ষ তরুণ-যুবক যুদ্ধবিমানের ককপিটে প্রবেশ করত, ট্যাঙ্ক চালিয়ে অথবা অশ্বারোহী সেনা হিসাবে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ত, ধ্বংস করত বর্বর শত্রুবাহিনীকে।

শপথ গ্রহণের পর সোভিয়েত সেনারা একজন নেতার দিকেই নির্দেশের অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকত, তাঁর কথাই তাদের কাছে শিরোধার্য ছিল। সেই নেতার নাম স্ট্যালিন, যিনি নিজের দেশকে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, স্বদেশের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর প্রতি যাঁর ছিল স্নেহভরা অতন্দ্র দৃষ্টি। স্ট্যালিনই সেই মহান নেতা, যিনি সাম্যবাদে পৌঁছনোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। এই স্ট্যালিনের নামেই শপথ নিয়ে সোভিয়েত সেনারা প্রতিজ্ঞা করেছিল, জার্মানির বর্বর ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে তারা ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করবে। নিজেদের সেই প্রতিজ্ঞা তারা রক্ষা করেছিল।

লালফৌজের সেই মহান শপথ আকাশে-বাতাসে মুখরিত হোক, ভয় ধরাক সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বুকে।

(সূত্র ঃ নর্থস্টার কম্পাস, মার্চ-এপ্রিল, '১১)

ডি এস ও-র উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট

২১ মে বরানগর বি কে সি কলেজের মাঠে ৮টি স্কুলের ১২ টিমের নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এ আই ডি এস ও আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড ইমতিয়াজ আলম, এস ইউ সি আই (সি) আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড পূর্ণ সামন্ত ও শিক্ষাকর্মী অরবিন্দ মাহাতো। টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেন কমরেড গৌরাঙ্গ দেবনাথ।

টিউনিশিয়ায় সমান্তরাল সরকার গঠনের চেষ্টা

উত্তর আফ্রিকার ছোট্ট দেশ টিউনিশিয়া গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে বিশ্ব জুড়ে সংবাদের শিরোনামে উঠেছিল। এক সব্জি বিক্রেতাকে পুলিশের মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা টিউনিশিয়া বারুদের মতো ফেটে পড়ে। বিরোধী সব রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সকলেই এই আন্দোলনে নেমে যায়। যার ফলে সেখানকার প্রেসিডেন্টকে দেশত্যাগ করতে হয়।

পুলিশি আক্রমণকে কেন্দ্র করে গোটা দেশের মানুষের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দেয় দেশটি আসলে দাঁড়িয়ে আছে বিস্ফোভের বারুদের স্তূপের উপর। কেন এই বিস্ফোভ? এর পিছনে রয়েছে জনজীবনের তীব্র অর্থনৈতিক সংকট যা সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বৈরশাসন। টিউনিশিয়ার জনগণের কাছে এই আন্দোলন রীতিমতো একটা বিপ্লবের মতো। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটই হোক বা স্বৈরশাসনই হোক তা নির্মূল হতে পারে না পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ না করলে।

সেখানকার আন্দোলনকারী শক্তিগুলির বর্তমান ভূমিকা কী? এ বিষয়ে কানাডার নর্থস্টার কম্পাস পত্রিকা জানাচ্ছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি সরকারবিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল এক বৈঠকে মিলিত হয় এবং একটি জাতীয় কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই দলগুলির মধ্যে রয়েছে ১০টি বামপন্থী গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী দল, রয়েছে ইসলামিক সংগঠন, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, আইনজীবীদের সংগঠন, লেখক ও সাংবাদিকদের সংগঠন। এই কমিটি দেশের মধ্যে সংঘটিত নানা সংঘর্ষ ও দুর্নীতির তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিউনিস্ট পার্টি অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অব টিউনিশিয়া (পিসিওটি)র প্রতিনিধি সামির হামোদা ফ্রান্সে নর্থস্টার পত্রিকাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বিরোধীদের এই উদ্যোগ আসলে সরকারি ক্ষমতার সমান্তরাল অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রচেষ্টা। এটা হল ২৮টি বিরোধী শক্তির মধ্যে এক সমঝোতা যা বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা ও তার বিকাশে সাহায্য করবে। কমিটি স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় সকল স্তরেই গড়ে উঠেছে। তারা সারা টিউনিশিয়া জুড়ে ধর্মঘট, আন্দোলন, মিটিং সংগঠিত করবে। এই কমিটি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং কার্যকরী হয়ে উঠেছে, যা বিপ্লবী আন্দোলন দানা বাঁধতে সাহায্য করবে।

১৩ ফেব্রুয়ারি এই কমিটির এক সভায় ৫০০০ প্রতিনিধি সামিল হয়েছেন, আরও ১০০০ উৎসাহী মানুষ আন্দোলনে যোগ দিয়ে হলের বাইরে সমবেত হয়ে ঘটনাক্রম লক্ষ করেছেন। এই সভা ব্যাপক প্রেরণার সৃষ্টি করেছে, 'বিপ্লবী আন্দোলন' এগিয়ে নিয়ে যেতে নানাবিধ কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। (সূত্র ঃ নর্থস্টার কম্পাস, মার্চ-এপ্রিল, ২০১১)

মহারাষ্ট্রে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের জয়

একের পাতার পর

মুম্বাইয়ের গোলিবার এলাকায় প্রতিরক্ষা ও রেল মন্ত্রকের আওতাধীন, পড়ে-থাকা ১৪০ একর জমিতে গড়ে ওঠে গণেশ কৃপা সোসাইটি বসতি। ১৯৬০ সাল থেকে এই বসতিটিতে বাস করছে ২৬ হাজারেরও বেশি পরিবার। সম্প্রতি শিবালিক ভেঞ্চার্স পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীকে ব্যবহার করে বসতির মানুষগুলিকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে সামিল হয়। জানা গেছে, এই শিবালিক ভেঞ্চার্সকে টাকা জোগায় টু-জি কেলেংকারিতে জড়িত 'ইউনিটেক' নামক সংস্থা।

এই উচ্ছেদ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এলাকার সাধারণ মানুষ। শ্রীমতী মেধা পাটকর আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে এই চক্রান্তের প্রতিবাদে ২০ মে থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে রিলে অনশনে যোগ দেন ১২০০-রও বেশি মানুষ। গোলিবারের গণেশ কৃপা সোসাইটি বসতিটি উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবির সাথে তাঁরা 'মহারাষ্ট্র স্লাম এরিয়া অ্যাক্ট, ১৯৭১'-এর ৩কে ধারাটি বাতিলের দাবিও তোলেন। এই ধারা অনুযায়ী মহারাষ্ট্র সরকার বস্তিবাসীদের মতামত ছাড়াই তাদের বসবাসের জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। ৩-কে ধারা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই যে সব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা এবং মুম্বাইয়ে 'রাজীব আবাস যোজনা' প্রকল্পটি রূপায়িত করার দাবিও জানিয়েছেন শ্রীমতী মেধা পাটকর ও তাঁর সহযোদ্ধারা।

অনশন আন্দোলনের চতুর্থ দিন থেকেই শ্রীমতী পাটকরের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। অষ্টম দিনে তাঁর বুকে যন্ত্রণা শুরু হয় এবং বমি হতে থাকে। চূড়ান্ত দুর্বলতায় আচ্ছন্ন শ্রীমতী পাটকর অন্য কারও সাহায্য না নিয়ে হাঁটাচলা পর্যন্ত করতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বিশিষ্ট মানুষ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আন্দোলনের ন্যায্য দাবিগুলি পূরণের জন্য মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাতে থাকেন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ মে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে শ্রীমতী পাটকরের শারীরিক অবস্থার অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে দাবিগুলি পূরণে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। দলের সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডলও প্রধানমন্ত্রী ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা দুটি চিঠিতে, শ্রীমতী পাটকরের নেতৃত্বাধীন এই আন্দোলনের দাবিগুলির প্রতি সহমত ব্যক্ত করে অবিলম্বে তাঁদের হস্তক্ষেপ দাবি করেন এবং শ্রীমতী পাটকরের জীবন রক্ষার অনুরোধ জানান।

অবশেষে চারিদিকের প্রবল চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় মহারাষ্ট্র সরকার। মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহান আন্দোলনের দাবিগুলিতে সহমত হলে টানা নয় দিন পর ২৮ মে শ্রীমতী মেধা পাটকর অনশন ভঙ্গ করেন। শ্রীমতী পাটকর যে সংগঠনের নেত্রী, সেই এন এ পি এম-এর পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, সরকার এই আন্দোলনের প্রধান পাঁচটি দাবি মেনে নিয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্র সরকার দুটি যুক্ত কমিটি গঠন করতে রাজি হয়েছে। এই কমিটি দুটিতে রাজ্যের বিশিষ্ট মানুষজন সদস্য হিসাবে থাকবেন। একটি কমিটি গোলিবার বসতি উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এবং অপরটি, অন্য ১৫টি বস্তি এলাকায় যেখানে মহারাষ্ট্র স্লাম অ্যাক্টের ৩-কে ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করবে। প্রথমটি ১৫ জুন ও দ্বিতীয়টি ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে। রিপোর্ট তৈরি হওয়া পর্যন্ত গণেশ কৃপা সোসাইটি বসতি ভাঙা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করবে মহারাষ্ট্র সরকার।

গোলিবার গণেশ কৃপা হাউসিং সোসাইটির বাসিন্দা ৮০ বছরের এক বৃদ্ধার দেওয়া ফলের রস খেয়ে শ্রীমতী মেধা পাটকর অনশন ভঙ্গ করেন। এই বৃদ্ধা আকাংখা বাই বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে জেল খেটেছেন। এদিন শ্রীমতী মেধা, আন্দোলনের এই বিজয়কে ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাইয়ে মর্যাদার সঙ্গে বাস করার অধিকারের দাবিতে সংগ্রামরত লক্ষ লক্ষ মানুষের বিজয় বলে চিহ্নিত করেন। চার মাস বাদে কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করার পর শহরের দরিদ্র মানুষদের বসবাসের জন্য সরকারি জমি আদায়ের লক্ষ্যে তাঁরা 'জমিন হক সত্যাগ্রহ' শুরু করবেন বলে শ্রীমতী পাটকর জানান। গোলিবার বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে পাশে থাকার জন্য শ্রীমতী মেধা পাটকর এস ইউ সি আই (সি) দল ও তার কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের তুঘলকী কাণ্ডের প্রতিবাদ

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে খামখেয়ালিপনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 'স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার্থী সংগ্রাম কমিটি'র পক্ষ থেকে ২০ মে কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, কমিশনের পক্ষ থেকে ১৩ মে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়েছে যে, ২২ মার্চ প্রকাশিত শিক্ষক নিয়োগ প্যানেলে মুদ্রণজনিত কিছু ভুল ছিল। সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেল, পূর্ববর্তী প্যানেলের ৬৫ জন সফল প্রার্থীর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই অমানবিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ সম্পর্কে কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে উপযুক্ত ব্যাখ্যার দাবি জানিয়েছে সংগ্রাম কমিটি। সাথে সাথে যে ৬৫ জন পরীক্ষার্থীর নাম প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদেরও নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

সমাজকর্মী ডাঃ বিনায়ক সেন সংবর্ধনা সভা

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জামিন প্রাপ্ত বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ডাঃ বিনায়ক সেনের সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৫ মে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা 'ফ্রি বিনায়ক সেন ক্যাম্পেন — ডক্টরস ইন সলিডারিটি।' 'ক্যাম্পেন' কমিটির পক্ষ থেকে বিনায়ক সেন এবং তাঁর স্ত্রী ইলিনার হাতে স্মারক তুলে দেন ডাঃ অশোক সামন্ত, কবি শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডাঃ দেবাশীষ দত্ত এবং ডাঃ পূণ্যব্রত গুণ।

ডাঃ বিনায়ক সেনকে সংবর্ধিত করছেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। পাশে শ্রীমতী ইলিনা সেন ও ডাঃ অশোক সামন্ত

ডাঃ সেনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের শরিক মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি, ফোরাম ফর পিপলস হেলথ, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেক্যুলারিজম, অল ইন্ডিয়া ডি এস ও, সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম, লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার, জুনিয়র ডক্টরস ইউনিটি, হোমিও ডক্টরস ফোরাম সহ প্রায় সত্তরটি সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক ও অন্যান্য উপহার দিয়ে ডাঃ সেনকে অভিনন্দন জানানো হয়। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে ডাঃ অংশুমান মিত্র সংগঠনের কিছু প্রকাশনা তাঁর হাতে তুলে দেন। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক তাঁর হাতে তুলে দেন ডাঃ কিষান প্রধান।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা এবং জয়নগর থেকে নির্বাচিত এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ বিনায়ক সেনকে এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪ খণ্ডে প্রকাশিত 'নির্বাচিত রচনাবলী' উপহার দেন। উল্লেখ্য, ১৯ জানুয়ারি ডাঃ তরুণ মণ্ডল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডাঃ বিনায়ক সেনের নিঃশর্ত মুক্তির যথার্থতা তুলে ধরেছিলেন। ডাঃ মণ্ডল বলেন, এখন যোজনা কমিশনের চৌহদ্দির মধ্যে রাষ্ট্র হয়তো নতুন করে ডাঃ সেনকে অবরুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, উনি কোনও জনবিরোধী শর্তের কাছে মাথা নত করবেন না। এতদিনের অভিজ্ঞতা এবং রাষ্ট্র যে নীতির অনুসারী, তা থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয়, কমিশনে তাঁর উপস্থিতি দেশের জনস্বাস্থ্যের বিশেষ কোনও তারতম্য ঘটাবে না।

ডাঃ বিনায়ক সেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজ দেশ এক নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় আক্রান্ত। রাষ্ট্র তার নিজের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আজ আদিবাসীদের সমূলে উৎখাত করে ধনিক শ্রেণীর হাতে তুলে দেওয়াকেই আইন বলে চালাতে চাইছে। যুগে যুগে অনেক শোষণ অত্যাচার হয়েছে, কিন্তু এইভাবে অত্যাচারই আইন — এরকমটা আগে হয়নি। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি দেওয়ার দাবিতে তিনি সোচ্চার হন।

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের যৌক্তিকতা নিয়ে ডাঃ অংশুমান মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, জনস্বাস্থ্য পুষ্টির সঙ্গে যুক্ত। উভয় বিষয়ই আজ অন্যায্য বণ্টনের ফল।

কেন্দ্রীয় সরকারের আধা ডাক্তার তৈরি করার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ডাঃ কিষান প্রধানের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার নিরিখে এটি একটি জটিল বিষয়। তবে নীতিগতভাবে গ্রাম এবং শহরে একই মানের চিকিৎসক থাকা উচিত। গ্রামের মানুষের জন্য কম যোগ্যতামানের দ্বিতীয় শ্রেণীর চিকিৎসকের নীতির আমি বিরোধী। মানবাধিকার কর্মী শ্রী সুজাত ভদ্র রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি উত্থাপন করেন।

এই মহতী সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা অধিকার আইন

পরিবর্তনের দাবিতে কটকে শিক্ষকদের বিশেষ সভা

কেন্দ্রীয় শিক্ষার অধিকার আইনের (২০০৯) বিভিন্ন জনবিরোধী ধারার দ্রুত সংশোধন ও পরিবর্তন চেয়ে সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠন এ আই এফ ই এ-র আহ্বানে গত ২১-২২ মে ওড়িশার কটক শহরে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্য থেকে শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ওড়িশা মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষার অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক, বিশেষত ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া এবং সকলকে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট প্রদান, যোগ্যতার পরিবর্তে বয়স অনুপাতে শ্রেণীতে ভর্তি ইত্যাদি দিকগুলি চরম শিক্ষাস্বার্থবিরোধী। এ ছাড়া শিক্ষকদের রেজিস্ট্রেশন ও শপথ গ্রহণের বিষয়টিরও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সরকারকে শিক্ষার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক স্তরে বৃত্তি পরীক্ষা চালু করার দাবি জানানো হয়। এই সমস্ত দাবি নিয়ে জুন মাসের তৃতীয় / চতুর্থ সপ্তাহে দিল্লিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিব্বল এবং এন সি টি ই আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

এই সভায় বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এ আই এফ ই এ সাধারণ সম্পাদক বিবেকানন্দ দাস এবং পশ্চিমবাংলার প্রধান শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চাই

নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস, বিশেষ করে চাল-গমের মতো খাদ্যশস্যের চড়া দামে সাধারণ মানুষের দুরবস্থা চরমে উঠেছে। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাবারটুকু জোগাড় করতেই খেটে-খাওয়া মানুষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে। কিন্তু সরকার স্তোকবাক্য দিয়েই খালাস।

এ দেশে শহরের যেসব বাসিন্দার দৈনিক আয় ২০ টাকার কম এবং গ্রামের যে মানুষদের দৈনিক আয় ১৫ টাকার কম, কেবল তাদেরই দরিদ্র বলে মানতে রাজি এ দেশের সরকার। ফলে সরকারি মতে এদেশে দরিদ্রের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। যদিও এই সরকারেরই তৈরি করা অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের ৭৭ শতাংশ মানুষেরই দৈনিক আয় ২০ টাকার কম। এডিবি-র হিসাবে দৈনিক ৫৫.৬৫ টাকা উপার্জনক্ষম মানুষের উপরেই যদি খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির এত ব্যাপক প্রভাব পড়ে, তা হলে যে মানুষগুলির আয় দৈনিক ২০ টাকার নিচে, চাল-গমের এই আকাশছোঁয়া দামে তাদের দিনযাপন কী দুরূহ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেউ কেউ খাদ্যশস্যের দামবৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, দেশের মানুষের আয় বাড়ছে, ফলে খাদ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ছে এবং সেই বাড়তি চাহিদার কারণেই নাকি দাম বাড়ছে। একশ্রেণীর কলমজীবী এই তত্ত্বকে সমর্থন করে পাতা ভরা প্রবন্ধ লিখছেন।

বাড়তি টাকার জোগান চাহিদা সহ পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি জোগানও বাড়ে, তা হলে তো দাম বাড়ার প্রশ্ন ওঠে না! খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে তো ঘটনাটা এরকমই ঘটার কথা। কারণ, এই লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত পাওয়া ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের সর্বশেষ রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, এ বছর ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন ছাড়িয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত কোনও দিনই এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য দেশে উৎপাদিত হয়নি। ২০০৮-০৯ সালেও উৎপাদনের পরিমাণ কম ছিল না। সে বছর খাদ্যশস্যের ফলনের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ টন। কেবল ২০০৯-১০ সালে এই পরিমাণ সামান্য কমে হয়েছিল ২১ কোটি ৮০ লক্ষ টন। কিন্তু ফলনে এই কমতিটুকুর জন্য বাজারে খাদ্যপণ্যের জোগানে ঘাটতি হওয়ার কথা নয়, কারণ প্রতি বছর সরকারের খাদ্য দপ্তর পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত করে রাখে প্রয়োজনে বাজারে ছাড়বে বলে।

তা হলে চাল-গমের বাজারদর এত চড়া কেন? আসলে, কী ব্যবস্থা নিলে বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান খাদ্যের দাম দেশের অধিকাংশ খেটে-খাওয়া মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা যায়, সে সব নিয়ে সরকারের কার্যকরী কোনও চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রতি বছরই সরকারি গুদামে রাখা চাল-গম বৃষ্টির জলে ভিজে অথবা ইঁদুর ও অন্য পোকা-মাকড়ের উৎপাতে নষ্ট হয়। ২০১০-১১ সালের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৬ হাজার ৩৪৮ টন চাল-গম ইতিমধ্যেই এভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি খাদ্যশস্য নষ্ট হয়েছে গুজরাটে। পরের স্থানগুলিতে আছে উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্য।

এ তো গেল নষ্ট চাল-গমের কথা। বাকি সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ঠিক সময়ে সরকারি গুদাম থেকে বের করে বাজারে ছাড়া এবং রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায্য দামে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাটুকুও আমাদের চূড়ান্ত দক্ষ(!) সরকারি প্রশাসন করে উঠতে পারে না। তা ছাড়া উৎপাদিত ফসলের বেশিরভাগ অংশটাই ফসল ওঠার পরপরই চলে যায় বড় বড় মজুতদার-ব্যবসায়ীদের হাতে। বিপুল পরিমাণ ঋণে মাথা পর্যন্ত ডুবে থাকা অসহায় চাষির কাছ থেকে ফসল ওঠার পরে পরেই কম দাম দিয়ে যাবতীয় ফসল কিনে নেয় আড়তদার ও মজুতদাররা। বাজারে কী পরিমাণ চাল-গম ছাড়া হবে, তার সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে এই বৃহৎ মজুতদাররা। সরকারের বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই এদের ওপর। বরং শাসক দল ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে এরা অবাধে কালোবাজারি চালায়। বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে চাল-গমের দাম চড়িয়ে রাখে এরা। সব জেনেও নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নেয় সরকার। মুক্ত বাজারের মন্ত্র জপে বিজেপি সরকারে বসে অত্যাবশ্যক পণ্য আইনকে কার্যত তুলে দিয়েছিল। পরবর্তী নির্বাচনে জিতে কেন্দ্রীয় সরকারে বসেছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন প্রথম ইউপিএ সরকার, একে সমর্থন দিয়েছিল সিপিএম, সিপিআই। এরা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিবর্তনের 'কড়া' সমালোচনা করেছে অসংখ্যবার। কিন্তু এই আইনটিকে আবার ফিরিয়ে আনার সামান্যতম চেষ্টাও তারা করেনি। ফলে অবাধে চলেছে মজুতদারি-কালোবাজারি। বৃদ্ধ মা-বাবা ও শিশু সন্তানসহ পরিবারের সদস্যদের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ঘাম ছুটে যাচ্ছে, খেটে-খাওয়া মানুষগুলোর। ফসলের ন্যূনতম দাম না পেয়ে দেনার দায়ে বিপর্যস্ত চাষিরা একের পর এক আত্মহত্যা করছে। গত ১৬ বছরে প্রতিদিন গোটা দেশে গড়ে ৪৭ জন চাষি আত্মহত্যা করে এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি চেয়েছে। অথচ চোখে ঠুলি পরে কানে তুলো গুঁজে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। সাধারণ মানুষকে কীভাবে একটু সুরাহা দেওয়া যায়, তা নিয়ে নয়, তাদের চিন্তা ব্যবসায়ীদের মুনাফা কী করে বাড়ানো যায়, তাই নিয়ে। সেই কারণেই চলতি বছরে চাল-গমের ফলন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্র কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার খাদ্যশস্য রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার কথা বলতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ বাড়তি উৎপাদনকে কাজে লাগিয়ে বাজারে জোগান বাড়িয়ে চাল-গমের দাম মানুষের আওতায় নিয়ে আসার দরকার নেই। রপ্তানি করে কীভাবে কোটি কোটি টাকা মুনাফার ব্যবস্থা করা যায় ব্যবসায়ীদের জন্য— সেই নিয়েই কৃষিমন্ত্রীর চিন্তা। এই হল সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের জনদরদের আসল চেহারা।

খাদ্যপণ্যের নাগাল ছাড়ানো চড়া দামের সমস্যা আজকের নয়। এস ইউ সি আই (সি), দল গড়ে ওঠার প্রথম পর্ব থেকেই এই সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সুরাহার কথা বারবার বলে আসছে। দলের পক্ষ থেকে বারবার খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার দাবি তোলা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সরকার সরাসরি চাষির কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনে নেবে এবং নির্ধারিত দামে জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছে দেবে। খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার জন্য এস ইউ সি আই (সি)-র এই যুক্তিসঙ্গত দাবিতে কোনও সরকারই কর্ণপাত করেনি। পুঁজিপতিশ্রেণীর জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা গ্যারান্টি করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা এই পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধার সরকারগুলি কোনওভাবেই বৃহৎ ব্যবসায়ী-কালোবাজারি-মজুতদারদের অবাধ মুনাফা লুটের সুযোগে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। আর, এখন তো মুক্ত বাজারের জয়গানে কর্তাব্যক্তিরা এতই মুখর যে, 'অর্থনীতিবিদ'রা ছাপার অক্ষরে লেখেন, মজুতদারি নাকি আর্থিক অগ্রগতির পক্ষে কল্যাণকর, অর্থনীতির 'শ্রীবৃদ্ধি' ঘটলে মূল্যবৃদ্ধি নাকি ঘটবেই, তাকে মেনেও নিতে হবে। এই তত্ত্বে ক্ষুধাতুর মানুষ ভুলবে কি?

সিপিএমের গোপন অস্ত্রভাণ্ডার

(দুইয়ের পাতার পর)

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জঙ্গলমহল সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মজুত সমস্ত অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করতে হবে; ৩) নিরপেক্ষ তদন্ত করে সিপিএম-কে এই বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার মজুত করে গণহত্যা, গণধর্ষণ, ভয়াবহ সন্ত্রাসে প্রত্যক্ষ সাহায্যকারী ও এতদিন পর্যন্ত দেখেও না-দেখার ভানকরী এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করতে তারস্বরে মিথ্যা প্রচারকারী এস পি মনোজ ভার্মা সহ পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।